وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা মে ২০২৬

Web : www.al-itisam.com

দাজ্জালের ফিতনা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনা

www.al-itisam.com

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ١٠، ذو القعدة و ذو الحجة ١٤٤٧هـ / مايو ٢٠٢٦م العدد: ٧، الجزء: ١١٥
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৭ || ঈসায়ী ২০২৬ || বঙ্গীয় ১৪৩৩

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
মে - ০১	যুলক্বা'দাহ- ১৩	শুক্রবার	০৪.০৪	০৫.২৪	১১.৫৬	০৩.২২	০৬.২৭	০৭.৪৮
মে - ০৫	যুলক্বা'দাহ- ১৭	মঙ্গলবার	০৪.০১	০৫.২১	১১.৫৬	০৩.২১	০৬.২৯	০৭.৫১
মে - ১০	যুলক্বা'দাহ- ২২	রবিবার	০৩.৫৭	০৫.১৮	১১.৫৫	০৩.১৯	০৬.৩১	০৭.৫৪
মে - ১৫	যুলক্বা'দাহ- ২৭	শুক্রবার	০৩.৫৩	০৫.১৬	১১.৫৫	০৩.১৮	০৬.৩৪	০৭.৫৭
মে - ২০	যুলহিজ্জাহ- ০২	বুধবার	০৩.৫০	০৫.১৪	১১.৫৫	০৩.১৭	০৬.৩৬	০৮.০১
মে - ২৫	যুলহিজ্জাহ- ০৭	সোমবার	০৩.৪৮	০৫.১২	১১.৫৬	০৩.১৭	০৬.৩৯	০৮.০৪
মে - ৩০	যুলহিজ্জাহ- ১২	শনিবার	০৩.৪৬	০৫.১১	১১.৫৬	০৩.১৬	০৬.৪১	০৮.০৭

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+২	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০
নরসিংদী	-২	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+১	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+১
রাজবাড়ী	০	০	০
মুন্সিগঞ্জ	+৪	+৩	+২
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	+২
মাদারীপুর	+২	+২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+১	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+২
শেরপুর	-১	০	+৩
জামালপুর	-২	-২	০
নেত্রকোনা	-৪	-৩	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৩	-৩	-৫
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৯
রাঙ্গামাটি	-৫	-৬	-৮
বান্দরবান	-৪	-৫	-১০
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩
নোয়াখালী	-১	-১	-৪
লক্ষ্মীপুর	০	০	-৩
চাঁদপুর	-২	-২	-৩
ফেনী	-৩	-৩	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৪	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৪
সুনামগঞ্জ	-৭	-৬	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৭	+১০
নাটোর	+৪	+৫	+৬
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+১	+২	+৪
বগুড়া	+৪	+৫	+৪
নওগাঁ	+৪	+৫	+৮
জয়পুরহাট	+২	+৪	+৭

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৮
দিনাজপুর	+২	+১	+৮
গাইবান্ধা	-১	-২	+৪
কুড়িগ্রাম	-২	০	+৬
লালমনিরহাট	-১	+২	+৮
নীলফামারী	+১	+৩	+৯
পঞ্চগড়	+১	+৪	+১১
ঠাকুরগাঁও	+৩	+২	+১১

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৫	+৫	+২
বাগেরহাট	+৫	+৫	+১
সাতক্ষীরা	+৮	+৭	+৩
যশোর	+৬	+৬	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৫	+৫	+৫
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৪	+৩
নড়াইল	+৪	+৪	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+২	+২	-১
পটুয়াখালী	+৩	+২	-১
পিরোজপুর	+৪	+৩	০
ঝালকাঠি	+৩	+২	-১
ভোলা	+১	০	-৩
বরগুনা	+৪	+৩	-১

■ সূত্র : ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مجلة الإعتصام الشهرية

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

www.al-itisam.com

১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মে ২০২৬ইং,
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২-৩৩ বঙ্গাব্দ, যুলক্বা'দাহ-যিলহজ্জ ১৪৪৭

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**

» **কুরআনের গভীরে**

সূরা আল-ফাতিহার মর্যাদা ৩
-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক

» **প্রবন্ধ**

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম ৭
মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

কিতাবুল ইল্ম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ ১১
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

যিলহজ্জ মাস: পরিচয়, ফযীলত, তাৎপর্য ও করণীয় ইবাদতের পথচিত্র ১৪
-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ ১৪

কুরবানীর ইতিহাস, গুরুত্ব ও করণীয় আমল ১৮
-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)

যেসব দিনে ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ ২১
মূল: ড. আব্দুল আযীম আল-বাদাবী
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

কুরবানীর পশুর হাটে সতর্কতা প্রয়োজন ২৩
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার সংঘাত ২৫
-সায়্যিদ তানভীর নদবি

» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**

দু'আ: আদব, আহকাম ও ফযীলত ২৮

» **কুরআনের মর্মবাণী**

রবের বাণী ৩১
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» **খুলুকুল মুসলিম**

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে একজন মুসলিমের আচরণ ৩৪
মূল: সুলতান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উমরী
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী

» **ফাযায়েলে আমল**

যুলহিজ্জাহ মাসের ইবাদত ৩৫
-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)

» **সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন**

সুন্নাতে রাতেবা ও ফজরের সুন্নাত ৩৬
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

» **হেলথ কর্নার**

কাঁচা আমের উপকারিতা ও সতর্কতা ৩৭
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

» **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**

কুরবানীর হাট ৩৯
-আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান

» **কবিতা ॥ ৪১**

» **সংবাদ ॥ ৪৩**

» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৬**



সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

দাজ্জালের ফিতনা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনা

পৃথিবীতে যখনই কোনো ভয়ংকর-ভয়াবহ যুদ্ধ হয়, তখনই মিডিয়াতে দাজ্জাল ও শেষ যামানার যুদ্ধ আলোচিত হয়। অনেকেই এই বিষয়ে বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যাও প্রদান করে থাকে। কেউ মনে করেন দাজ্জাল হচ্ছে আমেরিকা, আবার কেউ মনে করেন দাজ্জাল হচ্ছে এআই (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স)। অন্যদিকে খ্রিষ্টান ও ইয়াহূদী ধর্মেও এন্টিক্রাইস্ট এবং মাসীহার একটি বিশ্বাস বিরাজমান রয়েছে। পৃথিবীর তিনটি ধর্মের মানুষই শেষ যামানায় একজন মাসীহ বা উদ্ধারকারীর অপেক্ষায় আছে। শেষ যামানায় সত্য সত্যই দুইজন মাসীহ আসবে। একজন হবে মিথ্যা মাসীহ; ইয়াহূদীরা সেই মিথ্যা মাসীহ তথা দাজ্জালের অনুসরণ করবে। আর সত্য ও প্রকৃত মাসীহ ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসরণ করবে মুসলিমরা এবং কিছু খ্রিষ্টানেরাও মুসলিম হয়ে তার অনুসরণ করবে। আর এই দুইজন মাসীহই কোনো কাল্পনিক বা কৃত্রিম শক্তি নয়; বরং আদম আলাইহিস সালাম-এর সন্তান তথা মানুষ। আদম আলাইহিস সালাম নিজে যেহেতু ৬০ হাত তথা ৪০ মিটার লম্বা ছিলেন, যা প্রায় ১০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান উঁচু—সেহেতু তার সন্তান দাজ্জাল বিশাল দেহের হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। অতএব, বিশাল দেহের যুক্তি দিয়ে দাজ্জালকে অস্বীকার করা বোকামি। যেখান স্বয়ং আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম নিজেই বিশাল দেহের অধিকারী, ঠিক তেমনি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আসমান থেকে নেমে আসা অসম্ভব কিছু নয়; যেখানে আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম নিজে আসমান থেকে নেমে এসেছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে দুনিয়া থেকে আসমান সফর করে পুনরায় পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।

দাজ্জালের ফিতনা হবে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা। আদম আলাইহিস সালাম-কে গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা এবং তার তাতে পতিত হওয়া, কাবীলের আপন ভাই হাবীলকে হত্যা করা, নূহ আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমের শিরকে লিপ্ত হওয়া ও লূত আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমের যেনা-ব্যভিচারে অভ্যস্ত হওয়া ইত্যাদি সকল ফিতনার চেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা। ফেরাউন ও নমরূদের চেয়েও ভয়াবহ হবে দাজ্জাল। কেননা পৃথিবীতে ফেরাউন ও নমরূদের মতো যত বাতিল ইলাহ আছে তারা কেউই তাদের রব হওয়ার প্রমাণ দিতে পারে না। ফলত তাদেরকে বাতিল প্রমাণ করা অতি সহজ। নদীনালা, খাল-বিল, বৃষ্টি ও ফসলাদি কিছুই তাদের আদেশে উৎপাদিত হয় না। ফলত তাদেরকে বাতিল প্রমাণ করত এক আল্লাহর ইবাদত করা কঠিন কিছু নয়। এই সমস্ত বাতিল ইলাহরা নিজেদের রব হওয়ার প্রমাণ দিতে না পারার পরও মানুষ তাদের ইবাদত করছে, তাহলে যেদিন দাজ্জাল রব হওয়ার প্রমাণ দিবে, যেদিন তার আদেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে, ফসলাদি উৎপাদিত হবে, সেদিন মানুষ কীভাবে নিজের ঈমান নিয়ে বাঁচবে। আর এই কারণেই দাজ্জালের ফিতনা ভয়াবহ। দাজ্জাল শুধু ইলাহর দাবি করবে না; তার রব হওয়ার প্রমাণও দিবে।

দাজ্জালের কাছে রব হওয়ার মতো প্রায় সকল ক্ষমতা থাকবে। এমনকি সে মৃতকেও জীবিত করতে পারবে। তার গতি হবে ঝড়ের সময় মেঘমালার গতির ন্যায়। সে ৪০ দিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে। যার প্রথম দিন হবে এক বছর, দ্বিতীয় দিন হবে এক মাস এবং তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহ। বাকী ৩৭ দিন হবে স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ চাইলে কোনো কারণ ছাড়াই এমনটি ঘটবে। অথবা দাজ্জালের আগমনে সৌরজগতে এমন বিশাল পরিবর্তন হবে যার ধাক্কা সামাল দিয়ে পৃথিবী ও সূর্যকে স্বাভাবিক হতে প্রথম দিন লাগবে এক বছর, দ্বিতীয় দিন লাগবে এক মাস এবং তৃতীয় দিন লাগবে এক সপ্তাহ। তারপর পরিপূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। দাজ্জালের প্রতি যারা ঈমান আনয়ন করবে, দুনিয়ার ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য মৌমাছির মতো তাদের পিছনে ছুটবে। দাজ্জালকে যারা অস্বীকার করবে, তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের জন্য আকাশের বৃষ্টি ও যমীনের ফসল পরিপূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। কাঠ চিবিয়ে খাওয়া ছাড়া আর কোনো খাবার থাকবে না। দাজ্জাল পৃথিবীর সকল শহরে প্রবেশ করবে; শুধু মক্কা-মদীনা ব্যতীত।

বাকি অংশ ৫৬ নং পেজে...

কুরআনের গভীরে

সূরা আল-ফাতিহার মর্যাদা

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক*

ভূমিকা: প্রতিদিন কমপক্ষে ১৭ বার পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের প্রতিটি রাকআতে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেশি পঠিত বাক্যগুলো হলো সূরা আল-ফাতিহার আয়াতসমূহ। কিন্তু সাত আয়াতের ছোট এই সূরার গভীরতা কতটুকু আমরা উপলব্ধি করি? রাসূল ﷺ বলেছেন, এটি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা। তিনি আরও বলেছেন, এমন সূরা আল্লাহ তাওরাত, ইনজীল, যাবূর—কোনো কিতাবেই নাযিল করেননি। আসুন, এই অসাধারণ সূরা সম্পর্কে একটু গল্প শুনি।

সাত আয়াতের এই সূরাটি কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরা। এমন একটি সূরা, যা রাসূল ﷺ অন্যকে শেখানো পছন্দ করতেন। আবূ সাঈদ ইবনু আল-মু'আল্লা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর সাথে মসজিদে নববীতে তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'আমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে অবশ্যই তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান একটি সূরা শিক্ষা দেব'। এরপর তিনি আমার হাত ধরলেন। যখন তিনি বের হতে চাইলেন, আমি বললাম, আপনি তো বলেছিলেন, আপনি আমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দেবেন! তখন তিনি বললেন, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ...﴾ অর্থাৎ 'আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দিয়ে শুরু হওয়া সূরাটি।[২]

এটি এমন একটি সূরা, নেকীর বিবেচনায় যার মতো মূল্যবান সূরা কোনো আসমানী কিতাবে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেননি। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ঘটা একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যেখানে রাসূল ﷺ উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, 'আমি কি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দেব, যার মতো সূরা না তাওরাতে, না ইনজীলে, না যাবূরে, না ফুরক্বানে (কুরআনে) নাযিল হয়েছে?' তিনি বললেন, জি, হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি ছালাতে কী পড়?' তিনি বললেন, আমি উম্মুল কুরআন (অর্থাৎ সূরা আল-ফাতিহা) পড়ি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! তাওরাত, ইনজীল, যাবূর কিংবা কুরআনে এর মতো কোনো সূরা নাযিল হয়নি'।[৩]

চিন্তা করুন! আল্লাহ যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, যত কিতাব নাযিল করেছেন—তাওরাত, ইনজীল, যাবূর বা কোনো ছহীফাতেই সূরা আল-ফাতিহার মতো সূরা নেই, না শব্দ বিন্যাসে, না অর্থের গভীরতায়, না মর্যাদায়। এটি একটি অনন্য দান, শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য। কিন্তু আমরা কি কখনও এই সূরার এই মাহাত্ম্য বুঝে মনের গভীর থেকে তেলাওয়াত করেছি? আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, একটি সূরা নাযিল করার জন্য আসমানের একটি বিশেষ দরজা খোলা হয়েছিল, একজন বিশেষ ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল এই সূরা নাযিল করার জন্য? আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ এই কথাগুলো উঠে এসেছিল, যেখানে জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলেন। হঠাৎ তিনি ওপর দিক থেকে একটি শব্দ শুনলেন। তখন তিনি মাথা তুলে বললেন, هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ 'এটি আসমানের একটি দরজা, যা আজ খোলা হয়েছে, এর আগে কখনো খোলা হয়নি'। এরপর এক ফেরেশতা অবতরণ করলেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, এ ফেরেশতা আজ পৃথিবীতে নেমেছেন, এর আগে কখনো নামেননি। সেই ফেরেশতা নবী ﷺ-কে সালাম দিয়ে বললেন, أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ

১* ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত; বিএ (অনার্স), কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সঊদী আরব।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৭৪।

৩. তিরমিযী, হা/২৮৭৫, ৩১২৫, শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ ছহীহ বলেছেন।

www.al-itisam.com

أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ‘আপনাকে দুটি নূরের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, যা আপনার পূর্বে কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি— (১) ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা আল-ফাতিহা) এবং (২) সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতসমূহ...’।[৪]

বিখ্যাত এই সূরার যে মহান বিষয়টি অধিকাংশ সময় আমরা এড়িয়ে গেছি, দিনে-রাতে অসংখ্য বার পড়েও আমরা যা জানিনি, সেটি হচ্ছে এই সূরায় আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি কথোপকথন। এই সংক্রান্ত ছহীহ মুসলিমে একটি অসাধারণ বর্ণনা আছে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি ছালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করেছি আর আমার বান্দা যা চাইবে তা-ই পাবে। বান্দা যখন বলে, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ তখন আল্লাহ নিজে বান্দার ওই কথার উত্তরে বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। এরপর যখন সে বলে, ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার স্তুতি করেছে। যখন সে বলে, ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ঘোষণা করেছে। যখন সে বলে, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ আল্লাহ বলেন, এটি আমার ও আমার বান্দার মাঝে আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা-ই পাবে’। অর্থাৎ সে আমার দাসত্ব করবে এবং আমার কাছেই সাহায্য চাইবে। দাসত্ব আমার জন্য আর সাহায্য তার নিজের জন্য। যখন সে বলে, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ অর্থাৎ ‘আপনি আমাকে সহজ সরল পথ দেখান। তখন আল্লাহ বলেন, ‘এটি আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা-ই পাবে’।[৫]

এই হাদীছ আমাদের শেখায় যে, সূরা আল-ফাতিহা কেবল মুখের উচ্চারণ নয়; বরং এটি বান্দার হৃদয়ের দরখাস্ত। যে ব্যক্তি এটি বুঝে পড়ে, তার ছালাত বদলে যায়। সে তখন আর শুধু একটি আনুষ্ঠানিক কাজ করে না; বরং রবের সামনে দাঁড়িয়ে গভীরতম আবেদন জানায় এবং এই বিশ্বাসের সহিত আবেদন জানায় যে, তার পাঠ করা প্রত্যেকটা বাক্যের আল্লাহ উত্তর দেন। এটি যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত, যেখানে এই বিশ্বজগতের মহান মালিক তার গোলাম বা দাসের জবাব দিচ্ছেন। ক্ষুদ্র ও নগণ্য গোলাম প্রশংসা করছে এবং সুমহান আল্লাহ তাঁর গোলামের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। বান্দা সাহায্য চাইছে এবং আল্লাহ কবুল করছেন। প্রতিটি ছালাতে, প্রতিটি রাকআতে— এই সংলাপ চলছে। কিন্তু আমরা কতবার এই বিশেষ কথোপকথন অনুধাবন করে থাকি? কতবার এই অনুভূতির সাথে এই সূরা তেলাওয়াত করি যে, আল্লাহ আমার কথার প্রত্যুত্তর করছেন। একারণেই সূরা আল-ফাতিহার দৈনন্দিন জীবনের উপকারিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— এটি মানসিক চাপ, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা কমাতে সাহায্য করে। এর রহমতভিত্তিক আয়াতগুলো মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। ফলে দ্রুতগতির ও চাপপূর্ণ জীবনে এটি এক গভীর আবেগগত আশ্রয় হয়ে ওঠে। যখন সে অনুধাবন করে যে, সে আল্লাহর সাথে কথা বলছে, তখন সংকটের সময় এ সূরা পাঠ অন্তরে প্রশান্তি আনে।

এই সূরা সম্পর্কে হাসান বাছরী রাহিমাহুল্লাহ একটি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ১০৪টি কিতাব নাযিল করেছেন। সব কিতাবের জ্ঞান চারটিতে (তাওরাত, ইনজীল, যাবূর, কুরআন) আছে। চারটির জ্ঞান কুরআনে আছে। কুরআনের জ্ঞান মুফাছ্ছালে আছে। মুফাছ্ছালের জ্ঞান উম্মুল কুরআনে (ফাতিহায়) আছে।

আর সূরা ফাতিহার সারমর্ম হলো ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ‘আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই’ এই আয়াতে।

সূরা আল-ফাতিহা ছালাতের রুকন, এটি ছাড়া ছালাত ছহীহ হয় না। সূরা আল-ফাতিহার সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত হলো- এটি ছালাতের একটি মৌলিক রুকন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটি ছাড়া ছালাত পূর্ণ হয় না। হাদীছে এসেছে, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ‘যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা আল-ফাতিহা) পাঠ করেনি, তার কোনো ছালাত নেই’।[৬] এই হাদীছ সূরা আল-ফাতিহার শারঈ মর্যাদাকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। ছালাত ইসলামের স্তম্ভ আর সেই ছালাতের অন্তরে আছে সূরা আল-

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৬; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১০২২।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৫।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৪।

ফাতিহা। একজন বান্দা প্রতিদিন বহুবার সূরা আল-ফাতিহা পড়ে যেন নিজের ঈমান, আনুগত্য ও হেদায়াতের আবেদনকে নবায়ন করে।

সূরা আল-ফাতিহার চিকিৎসাগত উপকারিতা শারীরিক ও আত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। একারণেই একে কখনো 'আশ-শিফা' বা 'আরোগ্য' বলা হয়। এটি একটি শক্তিশালী রুকইয়া; সুরক্ষা ও চিকিৎসা দুটোর ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার রয়েছে। ইসলামী চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটি নানা রোগে পাঠ করা হয় এবং তা চিকিৎসা গ্রহণের বিকল্প নয়, বরং এটি আল্লাহর উপর আস্থা রেখে একটি সহায়ক আত্মিক চিকিৎসা। রাসূল ﷺ-এর ছাহাবীগণ বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছেন। আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, এক সফরে কিছু ছাহাবী এক আরব গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা আতিথ্য চেয়েছিলেন, কিন্তু গোত্রটি তাদের আপ্যায়ন করেনি। এই সময়টুকুর মধ্যেই সেই গোত্রের প্রধানকে সাপ বা বিচ্ছু দংশন করে। তখন তারা ছাহাবীদের কাছে এসে সাহায্য চায়। তখন ছাহাবীদের একজন সূরা আল-ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়ে রুকইয়া করেন এবং লোকটি এমনভাবে সুস্থ হয়ে যায়, যেন তার কিছুই হয়নি।[৭]

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, সূরা আল-ফাতিহা আল্লাহর ইচ্ছায় শিফার মাধ্যম হতে পারে। আধুনিক সময়েও অনেক মুসলিম মাথাব্যথা, উদ্বেগ বা অসুস্থতার সময় পানি পড়ে বা আক্রান্ত স্থানে ফুঁ দিয়ে এ সূরা পাঠ করেন।

এর আয়াতগুলো গভীরভাবে ভাবলে দেখা যায়, এতে এমন এক আত্মিক থেরাপি আছে, যা মানুষের ভেতরের অশান্তিকে প্রশমিত করে, আল্লাহর প্রশংসা অহংকার ভেঙে দেয় আর হেদায়াতের দু'আ বিভ্রান্তি নিরাময় করে। শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি এটি দুঃখ, বিষণ্নতা ও অস্থিরতার মতো আবেগিক ক্ষত সারাতেও ভূমিকা রাখে। কারণ এটি মানুষের দৃষ্টি আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরিয়ে দেয়।

সূরা আল-ফাতিহা সম্পর্কে সবচেয়ে চমৎকার কথা বলেছেন ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ; তিনি বলেন, সূরা আল-ফাতিহা, যা 'ফাতিহাতুল কিতাব', 'উম্মুল কুরআন' এবং 'সাবউল মাছানী', এটি হলো পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য, উপকারী ওষুধ, সম্পূর্ণ রুকইয়া, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি ও সফলতার চাবি, শক্তি সংরক্ষণের মাধ্যম; দুশ্চিন্তা, কষ্ট, ভয় ও দুঃখ দূর করার উপায়। তবে তা তাদের জন্য, যারা এর মর্যাদা উপলব্ধি করে, এর হক্ব আদায় করে, নিজেদের রোগের ওপর যথাযথভাবে প্রয়োগ করে। নিশ্চয়ই সূরা আল-ফাতিহা পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ চাবি, যেমন এটি জান্নাতের ভাণ্ডারেরও চাবি। কিন্তু প্রত্যেকেই এই চাবি দিয়ে সঠিকভাবে তালা খুলতে পারে না! যদি ধনভাণ্ডারের অনুসন্ধানকারীরা এই সূরার গোপন রহস্য বুঝতে পারত, এর অর্থগুলো বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করত, এই চাবির উপযুক্ত দাঁত (যোগ্যতা ও প্রস্তুতি) তৈরি করত এবং সঠিকভাবে তা ব্যবহার করতে পারত; তাহলে তারা কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সেই ভাণ্ডারে পৌঁছে যেত।[৮]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তার জীবনের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন তার কিতাবে, যেখানে তিনি বলেন, এক সময় আমি মক্কায় এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে সময় আমি কোনো চিকিৎসক বা ওষুধ পাইনি। তাই আমি সূরা আল-ফাতিহা দিয়েই চিকিৎসা করতাম। আমি যমযমের পানি নিতাম, তার ওপর বারবার সূরা আল-ফাতিহা পড়তাম, তারপর তা পান করতাম। এর মাধ্যমে আমি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি। এরপর থেকে আমি বহু রোগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে শুরু করি এবং এর দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হই।[৯]

শেষের কথায় সূরা আল-ফাতিহার নামগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি তার গুরুত্ব একটু হলেও আমাদেরকে উপলব্ধি করাবে বলে মনে করি। ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ সূরা আল-ফাতিহার প্রায় ১২টি নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ ও সূরা আল-ফাতিহার কয়েকটি নাম উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে সবগুলো নাম উল্লেখ করা হলো—

(১) 'উম্মুল কুরআন', 'উম্মুল কিতাব' ও 'সাবউল-মাছানী':

ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৩৬।

৮. যাদুল মাআদ, ৪/৫১২-৫১৪।

৯. যাদুল মাআদ, ৪/২৫৪।

www.al-itisam.com

وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي ‘আলহামদুলিল্লাহ (সূরা আল-ফাতিহা) হচ্ছে ‘উম্মুল কুরআন’, ‘উম্মুল কিতাব’, ‘সাবউল-মাছানী’।[১০]

(২) আল-কুরআনুল আযীম: আবূ সাঈদ ইবনুল মু‘আল্লা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ‘সেটি হচ্ছে ‘সাবউল-মাছানী’ ও ‘আল-কুরআনুল আযীম’, যা আমি প্রাপ্ত হয়েছি’।[১১]

(৩) ছালাত: এটি সূরা আল-ফাতিহার আরেক নাম। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ‘আমি ছালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করেছি’।[১২] এখানে অধিকাংশ আলেম ব্যাখ্যা করেছেন যে, الصلاة দ্বারা সূরা আল-ফাতিহা উদ্দেশ্য। কারণ এর পরপরই আল-ফাতিহার আয়াতগুলো উদ্ধৃত হয়েছে। তাই ছালাত নামটি ব্যাখ্যাগতভাবে শক্তিশালী এবং এর ভিত্তি ছহীহ।

(৪) রুকইয়া: ছহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূরা আল-ফাতিহা পড়ে দংশিত ব্যক্তিকে রুকইয়া করেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ‘তুমি কীভাবে জানলে যে, সূরা আল-ফাতিহা রুকইয়া?’[১৩]

এই নামগুলোর বাইরে আরও কিছু নামের কথা তাবেঈগণ উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(ক) আল-হামদুলিল্লাহ: এটি খুবই পরিচিত নাম। কারণ সূরা শুরু হয়েছে, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ দিয়ে। এটি নাম হিসেবে প্রসিদ্ধ, যদিও এখানে আলাদা মারফূ ছহীহ দলীল উল্লেখ করা হয়নি।

(খ) আসাসুল কুরআন: ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمَّاهَا: أَسَاسَ الْقُرْآنِ ‘শা‘বী ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এর নাম দিয়েছেন ‘আসাসুল কুরআন’।[১৪] এটি মূলত ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর নামে একটি আছার; মারফূ হাদীছ নয়। তাছাড়া শা‘বী থেকে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর বর্ণনা সবসময় শক্তভাবে অবিচ্ছিন্ন কি-না, তা আলাদাভাবে যাচাইসাপেক্ষ। তাই এটিকে ছাহাবীর উক্তি হিসেবে, সেটাও সতর্কতার সঙ্গে বলা ভালো; নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ হিসেবে নয়।

(গ) আল-ওয়াক্বিয়াহ: এটি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ-এর নামকরণ। এটি আলেমের ব্যাখ্যামূলক নাম, হাদীছ নয়।

(ঘ) আল-কাফিয়াহ: এটি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর রাহিমাহুল্লাহ-এর নামকরণ। এটিও হাদীছ নয়।

(ঙ) সূরাতুছ ছলাহ ও আল-কান্য: এ দুটি নাম যামাখশারী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এগুলো তাফসীরী/অর্থগত নাম, ছহীহ হাদীছে সরাসরি সাব্যস্ত নাম নয়।

উপরের এই নামগুলো ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীর গ্রন্থে সূরা আল-ফাতিহার ব্যাখ্যার শুরুতে উল্লেখ করেছেন। এই নামগুলো জানলে আমরা একটা বিষয় উপলব্ধি করি যে, প্রত্যেক নাম সূরা আল-ফাতিহার কী কার্যকারিতার দিকে ইঙ্গিত করছে। যেমন সেটা পুরো কুরআনের সারমর্ম, তাই তার নাম উম্মুল কিতাব। এই সূরার মাধ্যমেই কুরআন শুরু করা হয়েছে, ফলে তার নাম ফাতিহা। এক বাক্যে আমরা বলতে পারি যে, তার প্রত্যেকটি নাম তার গুরুত্বকেই স্পষ্ট করে।

উপসংহার:

আমরা প্রতিদিন কমপক্ষে ১৭ বার সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে। এর বাইরে সুন্নাত, নফল মিলিয়ে আরও অনেক বার। কিন্তু কতবার আমরা ভাবি যে, আমি এমন একটি সূরা পড়ছি, যার তুলনা কোনো কিতাবে নেই? আমি এমন একটি সূরা পড়ছি, যা আসমানের দরজা খোলার সাথে এসেছিল? আমি এমন একটি সূরা পড়ছি, যেখানে আল্লাহ আমার প্রতিটি আয়াতের জবাব দিচ্ছেন? আমি এমন একটি সূরা পড়ছি, যেখানে সমস্ত জ্ঞানের সারাংশ আছে?

আগামীকাল ফজরের ছালাতে যখন ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ বলবেন; তখন থামুন, উপলব্ধি করুন, আল্লাহ শুনছেন এবং আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন। এটি শুধু একটি রুটিন নয়— এটি একটি সংলাপ। একটি সাক্ষাৎ। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সাক্ষাৎ। মালিকের সাথে গোলামের সংলাপ।

১০. সুনান তিরমিযী, হা/৩১২৪; সুনানে আবূ দাঊদ, হা/১৪৫৭, ‘ছহীহ’।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৭৪, ৪৭০৩, ৫০০৬।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৫।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/২২৭৬, ৫৭৪৯।
১৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/১০১।

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা‘আতের সাথে যোগদান করার হুকুম

মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
পরিমার্জন: সা‘দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুছায়্যিন
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ, তাঁর পরিবার-পরিজন, ছাহাবীবৃন্দ এবং তাঁদের যথার্থ অনুসারীগণের উপর।

মহান আল্লাহ সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং প্রতিটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পেছনে চালিকাশক্তি বা কারণ ধার্য করেছেন। এই সীমাবদ্ধতা মেনে চলা দ্বীনের একটি অনিবার্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর তারাই হলো সফলকাম’ *(আলে-ইমরান, ৩/১০৪)*।

এই মহিমান্বিত আয়াতের মর্মার্থ এবং কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বক্তব্যের আলোকে দায়িত্ব পালনের যে আবশ্যকতা রয়েছে, তাতে দেখা যায় যে— দ্বীনের প্রচার, দাওয়াত এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য উম্মাহর মধ্য থেকে একদল লোকের প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্য দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে। তারাই হবে সেই মূল ‘উম্মাহ’, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ পুরো উম্মাহকে (সাধারণ জনগণকে) জীবিত রাখেন।

দ্বীন হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মুসলিমদের শাসক এবং সাধারণ জনগণের প্রতি ঐকান্তিক কল্যাণ কামনা করা। তাই আমাদের জীবনযাত্রার বিষয়গুলো এমন কোনো জটিল আকার ধারণ করা উচিত নয়, যা আমাদের দ্বীনের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় এবং আমাদের মূল দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করে। আমাদের সেই মূল দায়িত্বগুলো হলো:

- আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া।
- সতর্ক করা ও সুসংবাদ প্রদান করা।
- মানুষের জন্য সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া।
- সংস্কার সাধন ও নছীহত করা।
- স্মরণ করানো ও দ্বীন প্রচার করা।
- আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও দ্বীনকে বিজয়ী করা।
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা।

এই সমস্ত শারঈ রূপরেখা ও দায়িত্বকে একটিমাত্র উদ্দেশ্যই একত্রিত করে, আর তা হলো: **দ্বীনের বিজয় এবং এর সুরক্ষা**।

আমরা আরো দেখতে পাই যে, বর্তমানে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা ও পরিবর্তনের এক প্রবল ঢেউ চলছে, যা উম্মাহর গভীরে এবং এর প্রতিটি স্তম্ভে ছড়িয়ে পড়েছে।

এর বিপরীতে আমরা উম্মাহর একদল দাঈর হিম্মত ও প্রচেষ্টা দেখতে পাই, যারা উম্মাহকে এই পতন থেকে উদ্ধার করতে এবং এর অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান। তাদের অন্যতম আহ্বান হচ্ছে, **‘ইসলামের দিকে এসো, ইসলামের দিকে এসো’**; কিন্তু তা করা হচ্ছে দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক স্লোগানের অধীনে, যা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। এরপর একটি জামা‘আত বা দল একাধিক ‘উপদলে’ বিভক্ত হয়ে ফেরকায় পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলেছে নির্দিষ্ট কোনো ‘প্রতীক’, সংকীর্ণ ‘স্লোগান’ কিংবা নতুন কোনো ‘উপাধি’র বেড়াজালে, যা শুরুতে কেবল একটি ‘শব্দ’ হিসেবে আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা একটি ‘উপদল’ বা স্বতন্ত্র মতবাদে রূপ নেয়, যার ক্রমবর্ধমান স্রোত উম্মাহর মধ্যে, বিশেষ করে উদীয়মান শ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

১৫* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

এরপর আমরা দেখি, এই দলীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ অনেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক সংঘাত ও উত্তেজনার গোলকধাঁধায় নিমজ্জিত এবং তারা নিজ নিজ মতবাদ রক্ষায় ও তার সমর্থনে নানা পথ অবলম্বন করে। এর ফলে একের পর এক ফেতনা বা গোলযোগের সৃষ্টি হয়, যার উত্তাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে; মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ দানা বাঁধে এবং বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতার ধূলিকণা উড়তে থাকে। তখন কলমগুলো কেবল জেদ আর আভিজাত্যের লড়াইয়ে বিষাক্ত শব্দ নিক্ষেপ করতে থাকে। আর এই অনৈক্য ও বিভেদই কোনো দলের সদস্যদের শক্তি ও সাহস ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

পরস্পরের প্রতি বিমুখতা ও পিঠ প্রদর্শনের ফলাফল কেবল দুর্বলতা, ফাটল আর বিচ্ছিন্নতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন, ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ ‘আর তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না, অন্যথা তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি (হাওয়া) বিলুপ্ত হবে’ *(আল-আনফাল, ৮/৪৬)*।

এভাবেই সময়ের পরিক্রমায় উম্মাহর দেহ থেকে এক-একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ না বিভিন্ন দল-উপদল মিলে একে গ্রাস করে নেয়; আর বর্তমানে এই ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছে।

এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর দিকে দাওয়াতের পথটি অনেকের কাছেই আজ বক্র বা জটিল হয়ে গেছে এবং তাদের বোধশক্তিতে দাওয়াতের প্রকৃত অর্থ বদলে গেছে। তারা এখন ‘দাওয়াতের পথ’কে কেবল তাদের নিজস্ব দল বা গোষ্ঠীর চশমা দিয়ে দেখে অথবা তাদের প্রতিপক্ষ দলগুলোর বিরোধিতার নিরিখে বিচার করে।

আমরা আরও দেখতে পাই যে, এই দলগুলোর বিষয়ে প্রচুর আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ফলে সত্য কখনো চাপা পড়ে যায়, আবার কখনো আংশিক জয়ী হয়। মানুষ এখন এক বিভ্রান্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে, যেখানে বিশৃঙ্খলা তাদের মারাত্মকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

একদল মানুষ পাশ্চাত্যকরণের (Westernization) প্রবল স্রোতে হারিয়ে গেছে। কারণ তারা তাদের বাস্তবতার সামনে কোনো সঠিক দিশা বা দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পায়নি।

অন্য দলকে বিশেষ কোনো জামা‘আত বা দল তাদের দলীয় বৃত্তে টেনে নিয়েছে। ফলে তারা ‘দলে যোগদান’, ‘ভ্রাতৃত্ব-সংহতি’ এবং ‘আনুগত্য’-এর মতো বিশেষ বিশেষ স্লোগানের বেড়াজালে প্রবেশ করে আনন্দিত হয়েছে।

আরেক দল আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছে এবং কেবলই প্রশ্ন করছে— প্রকৃত পথটি কোথায়?

এখান থেকেই একটি বড় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে, তা হলো:

দাওয়াতী কাজে সক্রিয় সমসাময়িক দল ও সংগঠনগুলোতে যোগদানের শারঈ বিধান কী?

এই প্রশ্নটির স্বরূপ নিচের বিষয়গুলোর মাধ্যমে ফুটে ওঠে—

আমাদের যুগে বিদ্যমান এসব দল (ইসলামী দল ও জামা‘আতসমূহ) কি দলীল এবং বিষয়বস্তুর বিচারে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য? নাকি এগুলো সেসব উপদলেরই ধারাবাহিকতা, যারা খোলাফায়ে রাশেদার যুগের পর মূল মুসলিম জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল— যদিও তাদের নাম, স্লোগান এবং কর্মপদ্ধতি ও পরিকল্পনায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে? যদি তাদের মধ্যে কোনো সাধারণ বা অভিন্ন দিক থেকে থাকে, তবে তা কী?

অথবা এমনও কি হতে পারে যে, সময়ের বিবর্তনে এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই দলগুলোই মুসলিমদের জন্য এমন এক ‘শ্বাস নেওয়ার পথ’ (সুযোগ) হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার মাধ্যমে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং মুসলিমদেরকে কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’-এর প্রকৃত দাবি ও অধিকারের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে?

অতীতের সেসব ফেরকা বা দল, যারা মূল মুসলিম জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, আসলে তারা ছিল যালেম। কারণ তারা ছিরাতুল মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেননা এসব দল ভ্রান্ত মতবাদ ও কুপ্রবৃত্তি লালন করেছিল। এছাড়া তারা এমন এক মুসলিম শাসন ব্যবস্থার অধীনে বাস করত, যেখানে আল্লাহর আইন কার্যকর ছিল। বর্তমানের দল ও সংগঠনগুলোর অবস্থা এর বিপরীত; কারণ তারা এমন সব সরকারের অধীনে

বাস করছে, যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামী শরী'আর শাসন থেকে বিচ্যুত, যদিও তারা কোনো না কোনোভাবে ইসলামের নাম ঘোষণা করে।

এমতাবস্থায়, এই দল বা সংগঠনগুলোর কাঠামোর মধ্যেই কি উম্মাহর মুক্তির উপায় নিহিত নাকি এর বাইরে অন্য কিছু আছে? শরী'আহ কোন ধরনের দলের সাথে যোগদানের অনুমতি দেয়? সেই মূল 'মুসলিম জামা'আত' কোনটি?- যা থেকে এই দলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে সেটি কোথায়? তার বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়ই-বা কী? এই সমসাময়িক দলগুলোকে কি সংস্কার বা সংশোধন করা সম্ভব, যাতে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ জামা'আতে পরিণত হয় এবং সবাই সেদিকেই ফিরে আসে? অথবা (এই জামা'আতগুলোকে কি সংস্কার করে এমন এক) পথে (পরিণত করা সম্ভব), যার উচ্চতাকে ইসলাম উচ্চতর করেছে এবং তাকে সুবিন্যস্ত করেছে ও তা ব্যতীত অন্য সব পথকে প্রত্যাখ্যান করেছে; যে পথের মাধ্যমে একজন মুসলিম তার রবের আনুগত্য করে এবং সেই পথের ওপর অটল থেকেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে?

এটিই সেই প্রশ্ন, যা এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আর একজন মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল-প্রমাণ এবং সমসাময়িক দলগুলোর বাস্তবতার সঠিক উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে এর উত্তর খুঁজছেন, ঠিক যেমন একজন অভাবী ব্যক্তি ধূলিকণার মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান আংটি খুঁজে বেড়ায়।

তাই উম্মাহর কল্যাণকামনা এবং ইসলাম ও মুসলিম জামা'আতকে বিচ্যুতির ব্যাধি থেকে রক্ষা করার স্বার্থে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে তুলে ধরা আলেমদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে— যাতে সবকিছু সঠিক পথের ওপর অটল থাকে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন, ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ 'সুতরাং আপনি সেভাবেই দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে' *(হূদ, /১১২)*। একইভাবে নবী ﷺ-এর মাধ্যমে তাঁর উম্মাহকেও এই নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ 'সুতরাং তোমরা তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাকো (অটল থাকো)' *(ফুছছিলাত, ৪১/৬)*।

ছহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপদেশ চাইলে তিনি তাকে বলেন, قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ 'বলো, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, অতঃপর তার ওপর অটল থাকো'।[১৬]

'বলো, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি'— নবী ﷺ তাঁর উক্ত বাণীর মাধ্যমে আক্বীদা সংশোধনের মর্ম এবং **'অতঃপর তার ওপর অটল থাকো'**-এর মাধ্যমে আমল সংশোধনের মর্ম একত্রিত করে দিয়েছেন। আর এই দুই ধরনের সংশোধনের ওপর ভিত্তি করেই মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বা জাগরণ সম্ভব হয়।

এই বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা ইসলামের এক মজবুত রশির সাথে যুক্ত। এটি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ, মুসলিম শাসক এবং সাধারণ জনগণের প্রতি ঐকান্তিক কল্যাণ কামনার একটি অনিবার্য অংশ। এটি দ্বীনের বাইরের কোনো বিষয় নয়; বরং পবিত্র শরী'আর বিধানে এর অনেক নজির রয়েছে, যা প্রাচীন ও আধুনিককালের আলেমগণ নিরলসভাবে বর্ণনা করে আসছেন। যেমন: হাদীছ বর্ণনাকারী (রাবী), সাক্ষী, ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী এবং দ্বীনের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি ও বিদ'আতের অনুসারীদের অবস্থা বর্ণনা করা। এছাড়া বিভিন্ন ফেরকা বা দল এবং মুফতী, বিচারক ও লেখকদের অবস্থা বিশ্লেষণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে তাদের জীবনচরিতে বিদ্যমান এমন সব প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করা হয়, যা অন্যদের পরিবর্তে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাযহাব, মতামত বা সংবাদ অনুসরণ ও গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই উম্মাহর কাছে সত্য প্রকাশ এবং নছীহতের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। আর 'ত্বয়েফা মানছূরা'-এর ছত্রছায়ায় এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পথ, যার মাধ্যমে মুসলিমদের থেকে বহিরাগত আবর্জনা বা বিচ্যুতি দূর করা হবে; ঠিক যেভাবে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা হয়।

এখানে সবচেয়ে সূক্ষ্ম একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো— নাম ও শারঈ পরিভাষাগুলোর ক্ষেত্রে 'ইলমি ভাষা' বা জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাষা মেনে চলা, যাতে শ্রোতা ও গবেষক অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র বুঝতে পারেন এবং অতীতের সমস্ত উপাদান ও অবস্থানের সাথে নিজের বিচ্ছেদ অনুভব না করেন। এছাড়া

১৬. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৫৪১৬, 'ছহীহ'।

নতুন উদ্ভাবিত ‘স্লোগান’গুলো যেন বোধশক্তিকে বিভ্রান্ত না করে, বিশেষ করে সেই সব স্লোগান, যেগুলোকে পুঁজি করা হয় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে অনেককে আকৃষ্ট করা হয়— যদিও সেগুলো ভেতর থেকে অন্তঃসারশূন্য। আপনি যদি গভীরভাবে দেখেন, তবে দেখতে পাবেন যে, এগুলোর সারমর্ম প্রাচীনকালের বিভিন্ন ভ্রান্ত ‘ফেরকা’র মতাদর্শেরই প্রতিফলন। পবিত্র শরী‘আহ প্রত্যাখ্যান করে এমন কতশত চিন্তাধারা, মতবাদ ও পথ যে এগুলোর আড়ালে ঢুকে পড়েছে! ‘ইলমি ভাষা’ বা ‘দ্বীনি ভাষা’কে বদলে দেওয়া অস্বাভাবিক বোঝা চাপানো ছাড়া আর কিছুই নয়, যা ঘরে সদর দরজার বদলে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার শামিল। ভাষাকে কলুষিত করা মানেই দ্বীনকে কলুষিত করা।[১৭]

অতএব, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অবশ্যই একমাত্র ‘ইলমি ভাষা’র ছাঁচেই হতে হবে। আমাদের উচিত, ‘ইসলামী জামা‘আত ও দলসমূহ’— এমন স্লোগান ব্যবহার না করে ‘ফেরকা’ (উপদল) শব্দটি ব্যবহার করা। কারণ মুসলিম জামা‘আত একটিই, যা একাধিক হয় না (যার মানদণ্ড হলো নবী ﷺ ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত মূলনীতি)। আর মূল **মুসলিম জামা‘আত** ব্যতীত বাকিরা সবাই মুসলিম জামা‘আতেরই অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ‘ফেরকা’। একইভাবে সুন্নাহর বিপরীতে আমাদের ‘বিদআত’ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত এবং বিদআতপন্থি ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের বিপরীতে ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত’ পরিভাষাটি ব্যবহার করা উচিত।

অনুরূপভাবে ‘আধ্যাত্মিক বিপ্লব’ (اَلْانْقِلَابُ الرُّوْحِيُّ) বা ‘রাজনৈতিক বিপ্লব’(اَلْانْقِلَابُ السِّيَاسِيُّ) -এর পরিবর্তে ‘আল্লাহর দিকে দাওয়াত’(اَلدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ) , ‘জিহাদ’(اَلْجِهَادُ) , ‘সশস্ত্র জিহাদ (اَلتَّفْجِيْرُ)’ ও ‘শাসনকর্তা নিয়োগ’(تَنْصِيْبُ الْوُلَاةِ) —পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা উচিত। কেননা ইসলাম করুণা ও হেদায়াতের জীবনব্যবস্থা, এতে কোনো জোর-জবরদস্তি বা অন্যায় নেই।

একইভাবে অভ্যুত্থান বা আন্দোলন (اَلْانْتِفَاضَةُ) শব্দের পরিবর্তে (শারঈ শব্দ ব্যবহার করা উচিত); কেননা কেবল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি- যেমন জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি বা ভীরু ব্যক্তিই কম্পিত বা আন্দোলিত হয়। ‘আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলন’ (اَلتَّحَرُّكُ وَالْحَرَكَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ)-এর পরিবর্তে ‘দাওয়াত’ (اَلدَّعْوَةُ), ‘সতর্কীকরণ’ (اَلْإِنْذَارُ)ও ‘পৌঁছে দেওয়া’ (اَلْبَلَاغُ)—পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা উচিত। কারণ আরবী ভাষায় اَلتَّحَرُّكُ বা আন্দোল/নড়াচড়া শব্দটি প্রতিটি সচল বস্তুর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, এমনকি যদি তা স্থান পরিবর্তন না করে বা তার মধ্যে জীবন না থাকে যেমন গাছের নড়াচড়া। আর اَلتَّحَرُّكُ বা আন্দোল/নড়াচড়া ভালোর জন্যও হতে পারে আবার মন্দের জন্যও হতে পারে।

আমাদের উচিত দ্বীনের স্তরসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে (বিবেক, অনুভূতি, মানবতা) পরিভাষাগুলোর পরিবর্তে (ইসলাম, ঈমান, ইহসান) পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা। এরকম আরো দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, যা উপস্থাপন করতে গেলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে। হায় আল্লাহ! এই নতুন উদ্ভাবিত পরিভাষাগুলোর কারণে জ্ঞানের ওপর এবং এর প্রকৃত সত্যের ওপর কত বড় অবিচারই-না করা হয়েছে! এগুলো সংশয় উসকে দেয়, সালাফে ছালেহীনের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং বিবাদ ও শত্রুতা পুনরুজ্জীবিত করে।

আপনি যেমনটি দেখেছেন, (জ্ঞানের ভাষা) পরিবর্তন করা যেমন কাঠামোগত বা শব্দের দিক থেকে হয়, তেমনি তা অর্থের দিক থেকেও হতে পারে। এটি করা হয় বিদআত ও বিভ্রান্তিকর কুপ্রবৃত্তিগুলোকে শারঈ শব্দ ও পরিভাষা দিয়ে ব্যক্ত করার মাধ্যমে; এটি ছিল মূলত ‘ইখওয়ানুছ ছাফা’-দের[১৮] কর্মপন্থা, যা তাদের লেখনিতে দেখা যায়।

এই উভয় পন্থাই[১৯] শরী‘আর ওপর একটি অবিচার। প্রথমটি হলো (পথভ্রষ্টতার পোশাক), আর দ্বিতীয়টি হলো (বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী); কারণ তারা বাতিলের সারমর্ম গ্রহণ করেছে এবং তাকে শরী‘আর বহিরাবরণ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।

মূল উত্তরের আগে আমি সাতটি গবেষণামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি ভূমিকা প্রদান করা জরুরী মনে করছি। যদিও এর ফলে মূল প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ হবে, তবে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বা সমস্যার আলোচনার আগে ভূমিকা পেশ করা একটি সুবিদিত পদ্ধতি।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

---

১৭. এখানে শব্দের মারপ্যাঁচে ফেলে মানুষকে বিভ্রান্ত না করার এবং ইসলামী পরিভাষাগুলো ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিভিন্ন ফেরকা মূলত: এই কাজটাই করে থাকে। —অনুবাদক

১৮. ‘ইখওয়ানুছ ছাফা’ হলো একটি গোপন ও বাতেনী দল, যারা গ্রিক দর্শন এবং বাতেনী আক্বীদা (গুপ্ত বিশ্বাস)কে ইসলামী আক্বীদার সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছিল। —অনুবাদক

১৯. অর্থাৎ শব্দ বা তার অর্থ পরিবর্তন করা। —অনুবাদক

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী-১৩ তম পর্ব)

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي المُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بِالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ.

পরিচ্ছেদ: ৩/৭. মুনাওয়ালা সম্পর্কে এবং উলামায়ে কেরাম অন্য শহরের আলেমদের নিকট যা লিখে পাঠাতেন সে সংক্রান্ত:

وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نَسَخَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ المَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ، وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الحِجَازِ فِي المُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ كَتَبَ لِأُمَرِيِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: «لاَ تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا». فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ المَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুবাদ: আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উছমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআন লিখে বিভিন্ন শহরে পাঠিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও মালেক ইবনে আনাস- তারা সকলেই মুনাওয়ালাকে জায়েয মনে করতেন। আর কিছু হিজাযবাসী হাদীছের ক্ষেত্রে মুনাওয়ালা থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। কেননা স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর কাছে আদেশ পৌঁছানোর জন্য লিখিত চিঠি দিয়ে বাহক পাঠিয়েছিলেন আর বাহককে বলে দিয়েছিলেন যে, সেই জায়গায় পৌঁছার পূর্বে সে যেন চিঠিটা না পড়ে; বরং সেখানে পৌঁছেই মানুষের সামনে এটি পড়ে শুনাবে এবং তাদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ সম্পর্কে অবগত করবে।

ব্যাখ্যা:

মুনাওয়ালা ও মুকাতাবা: হাদীছ বর্ণনার একটি বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে মুনাওয়ালা। সাধারণত আমরা জানি, শিক্ষক হাদীছ বলেন আর ছাত্র সেটি শুনেন। অথবা ছাত্র কোনো বই থেকে পড়ে শুনান আর শিক্ষক সেটি শুনেন। এই দুটি পদ্ধতিই হাদীছ বর্ণনার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পদ্ধতি। অন্যদিকে মুনাওয়ালা হচ্ছে শিক্ষক-ছাত্র কেউ কারো থেকে পরস্পরে সরাসরি শুনবেন না; বরং শিক্ষক তার লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাত্রের হাতে তুলে দিয়ে তাকে সেখান থেকে হাদীছ বর্ণনার অনুমতি দিবেন, তাহলে এই পদ্ধতিকে মুনাওয়ালা বলা হয়। আর যদি লেখক নিজে সরাসরি ছাত্রের হাতে লিখিত পাণ্ডুলিপি না দেন; বরং ছাত্র বরাবর চিঠির মাধ্যমে হাদীছ লিখে পাঠান অথবা পাণ্ডুলিপি লিখে পাঠিয়ে দেন, তাহলে তাকে মুকাতাবা বলা হয়। কেউ কেউ এগুলোর ক্ষেত্রে আলাদা করে ইজাযাত দেওয়ার শর্তারোপ করেছেন তথা শিক্ষক শুধু লিখিত চিঠি পাঠিয়েই বা পাণ্ডুলিপি হাতে দিয়েই ক্ষান্ত হবেন না, বরং আলাদা করে তাকে সেখান থেকে হাদীছ বর্ণনার অনুমতি দিবেন। এই পদ্ধতিতে হাদীছ বর্ণিত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি-না সে বিষয়েই ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এই অধ্যায়টি রচনা করেছেন।

অধ্যায়ের উদ্দেশ্য: অধ্যায়ের মূল হাদীছে যাওয়ার পূর্বেই সালাফদের মন্তব্য ও একটি হাদীছ তা'লীক্ব হিসেবে উল্লেখ করার মাধ্যমে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই অধ্যায় রচনার উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুনাওয়ালা পদ্ধতিতে হাদীছ বর্ণনা করা জায়েয এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এটির পক্ষেই তিনি তিনটি দলীল পেশ করেছেন— উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কুরআন লিখে পাঠানো, সালাফদের মন্তব্য ও সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি।

পূর্বের অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক: পূর্বের অধ্যায়গুলোতে হাদীছ বর্ণনার দুটি পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে, যথা- 'হাদ্দাছানা'র মাধ্যমে এবং শিক্ষকের সামনে ছাত্র পড়বে তার মাধ্যমে। তারই ধারাবাহিকতায় এই অধ্যায়ে হাদীছ গ্রহণ ও বর্ণনার আরেকটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

মুনাওয়ালায় বর্ণিত হাদীছ দলীলযোগ্য: মুনাওয়ালাকে দলীলযোগ্য প্রমাণ করতে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এখানে তিনটি দলীল পেশ করেছেন নিম্নে সেগুলো ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হলো।

১ম দলীল— উছমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কুরআন লিখে পাঠানো: ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এখানে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় বিভিন্ন শহরে কুরআন লিখে পাঠানোর তথ্য উল্লেখ করেছেন। উক্ত বর্ণনাটি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ নিজেই তার কিতাব ছহীহ বুখারীর কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআনে পরিপূর্ণ উল্লেখ

২০* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

করেছেন। নিম্নে সেই পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি তুলে ধরা হলো—

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَكَانَ يُغَازِى أَهْلَ الشَّأْمِ فِى فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلاَفُهُمْ فِى الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِى الْكِتَابِ اخْتِلاَفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِى إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِى الْمَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ. فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا فِى الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِى شَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ؛ فَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا ذلك حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِى كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ.

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু একবার উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তখন শামবাসীদের সাথে আর্মিনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে ইরাকবাসীরাও অংশগ্রহণ করছিল। সেখানে কুরআন তেলাওয়াতের ভিন্নতা দেখে হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সামনে বিষয়টি তুলে ধরে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এই উম্মাহকে রক্ষা করুন, তারা যেন কিতাবের ব্যাপারে ইয়াহূদী ও নাছারার মতো মতভেদে লিপ্ত না হয়। তখন উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট বার্তা পাঠালেন, আপনি আমাদের কাছে সেই ছহীফাগুলো (সংকলিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি) পাঠিয়ে দিন। আমরা সেগুলো থেকে কপি করে মুছহাফ প্রস্তুত করব, তারপর তা আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা সেগুলো উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কাছে পাঠালেন। এরপর উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু যায়েদ ইবনু ছাবেত, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর, সাঈদ ইবনুল আছ ও আব্দুর রহমান ইবনু হারেছ ইবনু হিশাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-কে নির্দেশ দিলেন, তারা সেই ছহীফাগুলো থেকে একাধিক মুছহাফ কপি করলেন। উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু কুরাইশ বংশীয় তিনজনকে বললেন, তোমরা এবং যায়েদ ইবনু ছাবেত যদি কুরআনের কোনো শব্দ (বা কোনো আরবী উচ্চারণ) নিয়ে মতভেদে পড়; তবে তা কুরাইশের ভাষায় লিখবে। কারণ কুরআন তাদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে।

তারা সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন। অতঃপর যখন হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ছহীফা থেকে মুছহাফ প্রস্তুত সম্পন্ন হলো, তখন উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু মূল ছহীফাগুলো হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করে মুছহাফ পাঠিয়ে দিলেন এবং আদেশ দিলেন ওই পাঠানো কপির বাইরে কুরআনের যে কোনো পৃথক ছহীফা বা ব্যক্তিগত মুছহাফ থাকলে তা পুড়িয়ে ফেলতে।[২১]

দলীল গ্রহণের যৌক্তিকতা: উক্ত ঘটনায় কেউ কারো থেকে কুরআন মুখস্থ শুনেনি বা কেউ কাউকে মুখস্থ শুনায়নি। শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর ভরসা করা হয়েছে। সেটিকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন শহরের মানুষ কুরআন মুখস্থ করেছে এবং প্রচার করেছে। সুতরাং কুরআনের ক্ষেত্রে যদি এভাবে লিখে পাঠানো দলীলযোগ্য হতে পারে, তাহলে হাদীছের ক্ষেত্রেও লিখে পাঠানো দলীলযোগ্য হবে।

২য় দলীল— রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লিখিত চিঠি: উক্ত আলোচনায় ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লা-হু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক চিঠি প্রেরণের একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ঘটনাটি তিনি তার বইয়ে অন্য কোথাও পরিপূর্ণরূপে নিয়ে আসেননি। ঘটনাটি বিভিন্ন তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থে পরিপূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সেই ঘটনাটি উল্লেখ করা হলো—

হিজরতের পর মুসলিমরা মদীনায় স্থিতিশীল হলেও কুরাইশদের সাথে উত্তেজনা চলমান ছিল। কুরাইশরা মক্কায় মুসলিমদের সম্পদ দখল করে রেখেছিল। এই প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোয়েন্দা তৎপরতার জন্য ছোট ছোট অভিযান (সারিয়া) প্রেরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপই একটি দল প্রেরণ করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ রাযিয়াল্লা-হু আনহু। এটি ছিল হিজরতের ২য় বছরের রজব মাসে।

নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি সিলমোহরযুক্ত চিঠি দিলেন এবং বললেন, ‘দুই দিন পথ অতিক্রম না করা পর্যন্ত চিঠিটি খুলবে না। তারপর খুলে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করবে। আর তোমার সঙ্গীদের কাউকে জোর করবে না’।

দুই দিন পর তিনি চিঠি খুলে পড়লেন। সেখানে লেখা ছিল, إِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي هَذَا فَامْضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةَ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، فَتَرَصَّدْ بِهَا قُرَيْشًا وَتَعَلَّمْ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهِمْ. ‘যখন তুমি আমার এই চিঠি পড়বে, তখন অগ্রসর হও যতক্ষণ না তুমি নাখলা নামক

২১. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৪।

www.al-itisam.com

স্থানে পৌঁছাও, যা মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে অবস্থিত। সেখানে কুরাইশদের ওপর নযর রাখবে এবং আমাদের উদ্দেশ্যে তাদের সংবাদ সংগ্রহ করবে’।

তিনি বললেন, ‘আমরা শুনলাম ও মানলাম’। তারপর সঙ্গীদের জানালেন, যে শহীদ হতে চায়, সে এগিয়ে আসুক, আর যে ফিরে যেতে চায়, সে ফিরে যেতে পারে।

তবে কেউই ফিরে যায়নি।

দলটি নাখলায় পৌঁছে একটি কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার মুখোমুখি হয়। সেখানে ছিল—

- আমর ইবনুল হাযরামী
- উছমান ইবনু আব্দিল্লাহ
- নওফাল ইবনু আব্দিল্লাহ
- হাকাম ইবনু কায়সান

তখন ছিল রজব মাসের শেষ দিন, যা হারাম মাস। ছাহাবীরা দ্বিধায় পড়লেন, তারা চিন্তা করলেন, যদি এখন আক্রমণ না করেন; তবে তারা মক্কার হারাম অঞ্চলে ঢুকে পড়বে। আর যদি এখন আক্রমণ করেন, তবে হারাম মাসে আক্রমণ করা হবে। শেষ পর্যন্ত তারা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ফলাফল:

- আমর ইবনুল হাযরামী নিহত হয় (প্রথম নিহত মুশরিক)
- দুজন বন্দি হয় ।
- একজন পালিয়ে যায়।

মদীনায় ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমি তোমাদের হারাম মাসে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিইনি’। তিনি গনীমতের মাল ও বন্দিদের গ্রহণ না করে অপেক্ষা করলেন। কুরাইশরা প্রচার করতে লাগল, মুহাম্মাদ হারাম মাসকে হালাল করে দিয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে আয়াত নাযিল করেন, ‘তারা আপনাকে হারাম মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এতে যুদ্ধ করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া, তাঁর প্রতি কুফরী করা, মাসজিদুল হারাম থেকে মানুষকে বের করে দেওয়া এসব আল্লাহর কাছে আরও বড় অপরাধ’ *(আল-বাক্বারা, ২/২১৭)*।

এরপর রাসূল ﷺ গনীমত গ্রহণ করেন এবং বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন।

গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল:

১. এটি ছিল ইসলামের প্রথম সরাসরি সংঘর্ষ।

২. প্রথম নিহত মুশরিক।

৩. প্রথম গনীমত অর্জন।

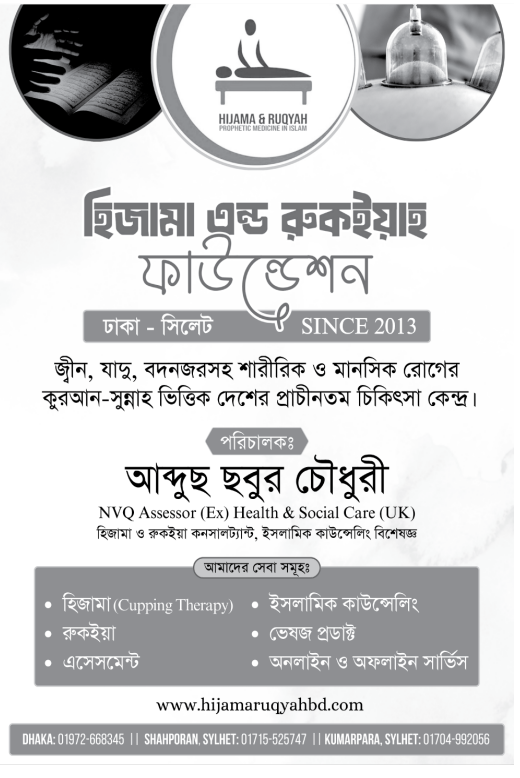
৪. মুসলিম-কুরাইশ সংঘাতের নতুন পর্যায় শুরু।[২২]

দলীল গ্রহণের যৌক্তিকতা: উক্ত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করার মাধ্যমে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার এই অধ্যায়ে যে দলীলটি গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষেত্রে এই ধরনের লিখিত আদেশ যদি গৃহীত হয়, তাহলে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রেও লিখিত হাদীছ গৃহীত হবে। কেননা এখানে লিখিত চিঠি দেওয়ার পর তা সামনাসামনি পড়া হয়নি, বরং দুদিন পর পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ফলত, উক্ত আদেশ শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হয়েছে। অতএব, এভাবেই চিঠিতে হাদীছ লেখার মাধ্যমে অথবা লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রদানের মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনা করা যায়।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

---

২২. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ১/৫৬৮; তারিখ আত-তাবারী, ২/৪০১; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩/২৫০; সীরাত ইবনু হিশাম, ২/২৫২।



www.al-itisam.com

যিলহজ্জ মাস: পরিচয়, ফযীলত, তাৎপর্য ও করণীয় ইবাদতের পথচিত্র

-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

ভূমিকা:

হিজরী বর্ষের ১২টি মাসের প্রতিটি মাসই বিশেষ তাৎপর্য ও ফযীলতের অধিকারী হলেও যিলহজ্জ মাসের মর্যাদা এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। এটি এমন একটি মাস, যেখানে রয়েছে আত্মশুদ্ধি, তাক্বওয়া অর্জন, কুরবানীর ত্যাগ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুবর্ণ সুযোগ। যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত এতটাই মর্যাদাপূর্ণ যে, তা শ্রেষ্ঠ আমলের শ্রেষ্ঠ সময় বলে গণ্য হয়। এই মাসে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের এমন সুযোগ দেন, যা বছরের অন্য কোনো সময়ে মিলে না। হজ্জের মাধ্যমে গুনাহ মাফ, কুরবানীর মাধ্যমে ত্যাগের পরীক্ষা আর সৎ আমলের মাধ্যমে জান্নাতের পথ প্রশস্ত করার সুযোগ ঘটে। অথচ আমাদের অনেকেই এই মহামূল্যবান দিনগুলোকে অবহেলায় কাটিয়ে দেই। এই প্রবন্ধে যিলহজ্জ মাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

যিলহজ্জ মাসের পরিচিতি:

হিজরী বর্ষের মাসের সংখ্যা ১২টি। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ ‘আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কিতাবে মাসগুলোর সংখ্যা হলো ১২। তার মধ্যে চারটি সম্মানিত মাস’ *(আত-তওবা, ৯/৩৬)*। এই ১২ মাসের শেষ মাস এবং চারটি সম্মানিত মাসের একটি হলো যিলহজ্জ। যিলহজ্জ মাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মাস, যে মাসে হজ্জ ও কুরবানী করা হয়ে থাকে। এ মাসেই মুসলিমদের অন্যতম উৎসব ঈদুল আযহা পালিত হয়।

যিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলার নিকট গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস যিলহজ্জ। অল্প সময়ে অধিক নেকী উপার্জনের জন্য মহান আল্লাহ বিভিন্ন মাস ও দিবসকে গুরুত্বারোপ করেছেন। অনুরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস হচ্ছে যিলহজ্জ মাস।

১. যিলহজ্জ হারাম বা সম্মানিত মাস: আল-কুরআনে বর্ণিত সম্মানিত চারটি মাসের একটি যিলহজ্জ মাস। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিদ্রোহ বা সংঘাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ ‘কাজেই ঐ সময়ের মধ্যে নিজেদের উপর যুলম করো না’ *(আত-তওবা, ৯/৩৬)*। চারটি হারাম মাস হলো যিলক্বদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব।

২. হজ্জের মাস যিলহজ্জ: উমরার জন্য সারা বছর সুযোগ থাকলেও হজ্জের জন্য শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত মাস রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ‘হজ্জ নির্দিষ্ট মাসগুলোতে। অতএব, এ মাসগুলোতে যে কেউ হজ্জ করার সংকল্প করবে, তার জন্য হজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয় এবং তোমরা যেকোনো সৎকাজই কর, আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় তাক্বওয়া বা আত্মসংযম। সুতরাং হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৭)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, হজ্জের সুনির্দিষ্ট মাসগুলো হলো শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ। আল্লাহ এ মাসগুলো হজ্জের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এ মাসগুলো ব্যতীত হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলে হজ্জ হবে না।

৩. যিলহজ্জ কুরবানীর মাস: কুরবানী করা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সুন্নাত, যা আমাদের মধ্যে সামর্থ্যবানদের আদায় করতে হয়। আর কুরবানীর জন্য একমাত্র মাস যিলহজ্জ। এই মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট চারদিন কুরবানী করার বৈধ সময়। কুরবানী করার সময় শুরু হবে ১০ যিলহজ্জ ঈদুল আযহার ছালাতের পর। ঈদের ছালাতের আগের কুরবানী আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ ‘যে ব্যক্তি ছালাতের পূর্বে যবেহ করেছে, সে যেন তদস্থলে আরেকটি যবেহ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের ছালাত আদায় করা পর্যন্ত যবেহ করেনি, সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে’।[২৪]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফযীলত:

মহান আল্লাহর কাছে যিলহজ্জ মাস পুরোটাই ফযীলতপূর্ণ। তবে প্রথম দশকের বিশেষ কিছু ফযীলত রয়েছে। যেমন-

১. যিলহজ্জের প্রথম দশক নিয়ে আল্লাহর কসম: মহান আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ের কসম করেছেন। অনুরূপভাবে যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের তিনি কসম করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿وَالْفَجْرِ-وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ ‘কসম ভোরবেলার! কসম ১০ রাতের!’ *(আল-ফজর, ৮৯/১-২)*। ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ

২৩* অধ্যয়নরত, আক্বীদা ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

২৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫০০; নাসাঈ, হা/৪৪১০।

www.al-itisam.com

বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যিলহজ্জ মাসের ১০ দিন।[২৫]

২. যিলহজ্জের প্রথম দশকের আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়: আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ 'যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমলের চেয়ে অন্য কোনো দিনের আমলই উত্তম নয়'। ছাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ছাড়া, যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না'।[২৬]

৩. বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক: জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ 'দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো যিলহজ্জের ১০ দিন'।[২৭]

৪. যিলহজ্জের প্রথম দশকে সকল মৌলিক ইবাদত একত্রিত হয়: এই দশকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রায় সকল ইবাদত একত্রিত হয়, যা অন্য কোনো সময়ে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন- হজ্জ, কুরবানী, ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বাসহ সকল ইবাদত এই ১০ দিনে একত্রিত করা যায়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ 'এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হলো- ঐ দিনগুলোতে মৌলিক ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে। যেমন- ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বা ও হজ্জ, যা অন্যান্য দিনগুলোতে এভাবে একত্রিত হয় না'।[২৮]

৫. যিলহজ্জের প্রথম দশকে দ্বীনের নিদর্শনসমূহের সম্মানের সময়: এই ১০ দিনে যেহেতু ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো একত্রিত হয়, সেহেতু আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শনসমূহকে সম্মান করা সহজ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ 'এটাই হলো আল্লাহর বিধান, যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাক্বওয়া থেকেই' *(আল-হাজ্জ, ২২/৩২)*। ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন সর্বোত্তম দিন আর রামাযান মাসের শেষ ১০ রাত সর্বোত্তম রাত।[২৯]

যিলহজ্জের প্রথম দশকে করণীয় আমল:

যিলহজ্জের প্রথম দশক দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য বিশাল নেয়ামত। এই দিনগুলো ইবাদতের একটা মৌসুম, যা বছরে মাত্র একবার আসে। তাই এই মৌসুমে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী করা সকলের জন্য উচিত। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের আমলগুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) 'আম বা সাধারণ ইবাদত। অর্থাৎ যেগুলো যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন ছাড়াও বছরের অন্যান্য দিনে করা যায়।

(খ) খাছ বা বিশেষ ইবাদত। অর্থাৎ যে সকল নেক আমল যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের সাথে সম্পৃক্ত, যা বছরের অন্যান্য দিনে করা যায় না।

(ক) প্রথম দশকের 'আম বা সাধারণ আমল:

১. তওবা ও ইস্তেগফার করা: তওবা অর্থ ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। নিজের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সারাজীবনের জন্য খারাপ কাজ থেকে ফিরে আসার দৃঢ় সংকল্প করা। যিলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলোতে তওবা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো, বিশুদ্ধ তওবা' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৮)*।

২. ফরয ও নফল ছালাতগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় করা: এই ফযীলতপূর্ণ দিনগুলোতে ফরয ও নফল ছালাতের ব্যাপারে খুবই যত্নবান হতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বলেন, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সঙ্গে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফরয ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই যে, (অবস্থা এমন যে) আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে আমার কাছে কোনো কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিই। আমি যে কোনো

---

২৫. উল্লেখকৃত আয়াতের তাফসীর দৃষ্টব্য।
২৬. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬৯; তিরমিযী, হা/৭৫৭।
২৭. ছহীহুল জামে', হা/১১৩৩; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১১৫০।
২৮. ফাতহুল বারী, ২/৪৬০।
২৯. মাওসূআতুল ফাতাওয়া আল-বাযিয়াহ, ৮৯০৮।

কাজ করতে চাইলে তাতে কোনো রকম দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ হরণে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকে, অথচ আমি তার প্রতি কষ্টদায়ক বস্তু দিতে অপছন্দ করি’।[৩০]

৩. ছিয়াম পালন করা: যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনে ছিয়াম পালন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। বান্দার পাপরাশি ক্ষমাকরণে ছিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা ছিয়াম পালনকারীকে আল্লাহ নিজ হাতে প্রতিদান দেন। তাই এ দিনগুলোতে খুব যত্নসহকারে ছিয়াম পালন করা উচিত। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ، بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে ৭০ বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন’।[৩১] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ছিয়াম পালন করতেন। তবে ঈদুল আযহা ও আইয়ামে তাশরীকের তিনদিন ছিয়াম পালন করা যাবে না।

৪. বেশি বেশি যিকির-আযকার করা: পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দিন যিলহজ্জের প্রথম দশক। তাই এই দিনগুলোতে অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি বেশি বেশি যিকির-আযকার করা উচিত। যিকর-আযকার বলতে অধিক পরিমাণে তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠ করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ ‘যেন তারা নিজেদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিযিক দিয়েছেন, তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে’ *(আল-হজ্জ, ২২/২৮)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ ‘এই দিনসমূহ আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাপূর্ণ এবং এই ১০ দিনের মধ্যে সম্পাদিত আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। সুতরাং এই দিনগুলোতে তোমরা বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করো’।[৩২]

চারটি যিকির বেশি বেশি পাঠ করার চেষ্টা করতে হবে। সেগুলো হলো তাসবীহ (سُبْحَانَ اللهِ), তাহমীদ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ), তাহলীল (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) এবং তাকবীর (اَللهُ أَكْبَرُ)।[৩৩]

৫. অধিক পরিমাণে দান-ছাদাক্বা করা: দান-ছাদাক্বা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর এই আমলটি করার সুবর্ণ সময় হলো যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক। দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, অভাবগ্রস্তকে উপকার করা যায় আর নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ ‘তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এবং তোমরা কোনো উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুলম করা হবে না’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৭২)*।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান-ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ‘তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা করো, এক টুকরা খেজুর ছাদাক্বা করে হলেও’।[৩৪]

এছাড়াও আমাদের উচিত কুরআন তেলাওয়াত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি দরূদ পাঠ, অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থেকে বেশি বেশি নেক আমলে রত থাকা আর সকল ধরনের পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

(খ) প্রথম দশকের খাছ বা বিশেষ আমল:

১. হজ্জ পালন করা: হজ্জ পালনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কয়েকটি মাস থাকলেও একমাত্র হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয় যিলহজ্জ মাসে। তাই সামর্থ্যবান সকল মুসলিমের উপর হজ্জ পালন করা ফরয *(আলে ইমরান, ৩/৯৭)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ‘যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে, তাতে কোনো অশ্লীল আচরণ করেনি, কোনো পাপে লিপ্ত হয়নি; তাহলে সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে গেল, যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল’।[৩৫] অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ‘এক উমরা থেকে অন্য উমরাকে তার মধ্যবর্তী পাপসমূহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর কবুল হজ্জের পুরস্কার কেবলই জান্নাত’।[৩৬]

২. ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করা: প্রথম দশকের অন্যতম আমল ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করা। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ‘রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন এবং সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ করতেন, তা হলো ছালাত আদায়। আর ছালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তারা কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাদের নছীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোনো সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোনো বিষয়ে নির্দেশ জারি

৩০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।
৩১. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৩।
৩২. আহমাদ, হা/৫৪৪৬; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১২৪৮।
৩৩. আহমাদ, হা/৫৪৪৬।
৩৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৪১৭।
৩৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৫০।
৩৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৮৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৯।

করার ইচ্ছা করতেন, তবে তা জারি করতেন। অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন’।[৩৭]

উল্লেখ্য, মহিলারাও ঈদের ছালাতে পুরুষদের সাথে পর্দা সহকারে গমন করে ছালাত আদায় করতে পারবে।

৩. কুরবানী করা: যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের বিশেষ আরেকটি আমল হলো কুরবানী করা। পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলিম সে হজ্জ পালনকারী হোন বা হজ্জের বাইরে থাকুন সকলেই এই দিনে কুরবানী করে আল্লাহর আদেশ পালন করেন। হজ্জে তামাত্তু‘ ও হজ্জে ক্বিরান পালনকারীগণ মিনা ও তার আশপাশের হারাম এলাকায় আর হজ্জের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুসলিমরা তাদের স্ব স্ব অবস্থানস্থলে কুরবানী করেন। কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ‘আপনি আপনার রবের জন্য ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন’ (আল-কাওছার, ১০৮/২)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ‘যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে’।[৩৮] তবে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে সে জন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আবূ বকর, উমার ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, বেলাল, আবূ মাসঊদ আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহুম প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[৩৯] প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর একটি পশু দ্বারা কুরবানী করাই যথেষ্ট।[৪০] তবে কুরবানীর ছওয়াব বিবেচিত হবে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ‘আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক’ *(আল-আনআম, ৬/১৬২)*।

তাই কুরবানী শুধু আল্লাহকে রাজি-খুশী ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করতে হবে।

৪. আরাফার ছওম পালন করা: সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ছিয়াম হলো আরাফার দিনের ছিয়াম। আর এই আরাফার দিন যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে। হজ্জ পালনকারী ছাড়া অন্যান্য মুসলিম এ দিনে ছওম পালন করবে। আবূ ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ-কে আরাফার দিনের ছওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ‘আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, এটা পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহর কাফফারা হবে’।[৪১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبَ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ ‘যে ব্যক্তি আরাফার দিন ছওম রাখে, তার পরপর দুই বছরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়’।[৪২]

৫. কুরবানীদাতার জন্য চুল ও নখ কর্তন না করা: যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের আরেকটি আমল হলো যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী পর্যন্ত চুল ও নখ কর্তন না করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ، ‘যে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখল এবং কুরবানী করার ইচ্ছা করল, সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে’।[৪৩]

৬. তাকবীর পাঠ করা: সাধারণত যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ১৩ তারিখ মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত বেশি বেশি তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পাঠ করতে হবে। বিশেষ করে ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ছালাত শেষে তাকবীর পাঠ করতে হবে।[৪৪] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু আরাফার দিন ফজর থেকে কুরবানীর দিন আছর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।[৪৫] তাকবীর হলো, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা‘বূদ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান আর সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য’।[৪৬]

হাজীগণ ইহরাম বাঁধার পর থেকে ১০ যিলহজ্জ কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়বেন। তালবিয়া হচ্ছে,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

‘আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। আমি হাযির। আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই’।[৪৭] এই দিনগুলোতে তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে হবে।[৪৮] তবে, নারীরা নিঃশব্দে তাকবীর দিবেন।

উপসংহার: উপরিউক্ত আমলগুলো পালনের মাধ্যমে যিলহজ্জ মাসের যথাযথ মূল্যায়ন করা যায়, ফযীলত লাভ করা যায় এবং নিজেদেরকে পাপমুক্ত করা যায়। অশেষ ছওয়াব হাছিলের মাধ্যমে জান্নাতের পথকে সহজ করা যায়। তাই আমাদের উচিত যিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইবাদত- বন্দেগী, নেক আমল ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে ফযীলতপূর্ণ উক্ত মাসকে বরণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

৩৭. ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬।
৩৮. ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৩; ছহীহুল জামে‘, হা/৬৪৯০।
৩৯. বায়হাক্বী, ৯/২৬৪, হা/১৯৫০৬; ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৩৯, ৪/৩৫৪; মিরআত, ৫/৭২-৭৩; উছায়মীন, মাজমূ ফাতাওয়া, ২৫/১০।
৪০. আবূ দাঊদ, হা/৭৮৮; তিরমিযী, হা/১৫১৮; মিশকাত, হা/১৪৭৮।
৪১. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩, ২৮০৩; আবূ দাঊদ, হা/২৪২৫।
৪২. ত্বাবারানী, হা/৫৭৯০; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১০১২।
৪৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭; আবূ দাঊদ, হা/২৭৯১; তিরমিযী, হা/১৫২৩।
৪৪. ইবনু তায়মিয়্যাহ, মাজমূউল ফাতওয়া, ২৪/২২০।
৪৫. যাদুল মাআদ, ২/৩৬০।
৪৬. দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১২৫, ৬৫৪।
৪৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৮৪; আবূ দাঊদ, হা/১৮১২।
৪৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭।

কুরবানীর ইতিহাস, গুরুত্ব ও করণীয় আমল

-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)*

কুরবানী আরবী শব্দ কুরবান হতে এসেছে, এর অর্থ নৈকট্য ও উৎসর্গ। শারঈ অর্থে ঈদুল আযহার দিন এবং তাশরীক বা ঈদের পরের তিনদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে যে পশু যবেহ করা হয় তাকে কুরবানী বলে। কুরবানীর ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহতে তিনটি শব্দ এসেছে— ১. নাহর, এর অর্থ উট কুরবানী করা। এর পদ্ধতি হলো হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালিতে বর্শা বা ছুরি দিয়ে আঘাত করা ও রক্ত বের করে দেওয়া। আর অন্যান্য পশুর ক্ষেত্রে জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালিতে ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা। ২. নুসূক বা মানসাক, এর অর্থ কুরবানী এবং ৩. উযহিয়্যাহ, এর অর্থও কুরবানী।

সর্বপ্রথম মানব আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই পুত্র কাবীল ও হাবীলের দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর রীতি চালু হয়েছে। তারপর থেকে সকল উম্মতের শরীআতে এই নিয়ম ছিল। আমাদের উপর যে কুরবানীর বিধান নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাঁর প্রাণপ্রিয় শিশু পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর জন্য কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে পরবর্তীতে শরীআতে মুহাম্মাদীতে স্বীকৃতি পায়।

কাবীল ও হাবীলের কুরবানীর ইতিহাস:

মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানিয়ে দিয়ে বলেন, ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ‘আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই পুত্রের বৃত্তান্ত আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনান। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল। তখন একজনের (হাবীলের) কুরবানী গৃহীত হলো এবং অন্যজনের (কাবীলের) কুরবানী কবুল হলো না। তখন (কাবীল) বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। (হাবীল) বলল, আল্লাহ তো মুত্তাক্বীদের কুরবানীই গ্রহণ করে থাকেন’ *(আল-মায়েদা, ৫/২৭)*।

তারা কী উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করেছিল সে সম্পর্কে তাফসীরে ইবনু কাছীরে এসেছে, দুনিয়ার প্রাথমিক অবস্থায় আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম-এর মিলনের ফলে সন্তান প্রজনন শুরু হয়। তখন প্রতি গর্ভ থেকে যমজ একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। সেই সময় আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম-এর শরীআতে বিশেষভাবে এ আদেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যা সহোদর বোন হিসেবে গণ্য হবে না, তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বৈধ হবে। এদিকে হাবীলের যমজ বোন কম সুন্দরী ছিল, কিন্তু কাবীলের যমজ বোনটি সুন্দরী ছিল। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবীলের যমজ বোনটি কাবীলের ভাগে পড়ে। এতে কাবীল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবীলের শত্রু হয়ে গেল। অতঃপর আদম আলাইহিস সালাম উভয়ের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য কুরবানী পেশ করতে আদেশ দিয়ে বললেন, যার কুরবানী গৃহীত হবে, সেই সুন্দরী কন্যার পাণি গ্রহণ করবে। সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, খোলা মাঠে কুরবানী উপস্থাপন করে আসলে আসমান থেকে একটি আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। আর আগুন এসে যে কুরবানী জ্বালিয়ে দিত না, তা প্রত্যাখ্যাত হতো। হাবীল ছিল মেষওয়ালা, তাই সে মোটাতাজা মেষ পেশ করেছিল। আর কাবীল ছিল কৃষক, তাই সে গম পেশ করেছিল। হাবীলের কুরবানী কবুল হলো আর কাবীলের কুরবানী গৃহীত হলো না। ফলে কাবীল হিংসায় ফেটে পড়ে হাবীলকে হত্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন হাবীল বলল, ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ- فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ‘আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি তোমার হাত প্রসারিত করলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি আমার হাত প্রসারিত করব না। নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি। নিশ্চয় আমি চাই তুমি আমার ও তোমার পাপ নিয়ে ফিরে যাও, ফলে তুমি আগুনের অধিবাসী হও এবং

৪৯* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

www.al-itisam.com

এটা অত্যাচারীদের প্রতিদান। অতঃপর তার আত্মা তাকে তার ভাই হত্যায় উত্তেজিত করল, সুতরাং সে তাকে (হাবীলকে) হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো' *(আল-মায়েদা, ৫/২৮-৩০)*।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার প্রিয় সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালাম -কে কুরবানী করার ইতিহাস:

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বপ্নে আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে নিজ পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম -কে তার সম্মতিতে কুরবানীর প্রস্তুতি নেন। যেহেতু নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন হলো এক প্রকার অহী। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ 'অতঃপর যখন সে (শিশু ইসমাঈল) তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন তার পিতা বলল, হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। অতএব, এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত?' ﴿قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ 'সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। ইনশা-আল্লাহ! আমাকে আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'। ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ- فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ 'অতঃপর বাবা-ছেলে উভয়েই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্য কাত করে শুয়েই দিলেন, তখন আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন, ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾। 'হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালে। নিশ্চয়ই আমি এভাবে সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার সন্তান কুরবানীর পরিবর্তে যবেহযোগ্য এক মহান জন্তু (জান্নাত হতে দুম্বা) দিয়ে কুরবানী করিয়ে তাকে (সন্তানকে) মুক্ত করে দিলাম। আর এ বিষয়টি (কুরবানীকে) পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০২-১০৮)*।

কুরবানীর গুরুত্ব:

কুরবানী যদিও সুন্নাত, তবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ 'আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে আমি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযিক দিয়েছি সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে' *(আল-হজ্জ, ২২/৩৪)*। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে লক্ষ্য করে বলেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ 'সুতরাং তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে ছলাত আদায় করো এবং কুরবানী করো' *(আল-কাওছার, ১০৮/২)*। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করে না, সে যেন অবশ্যই আমাদের মুছল্লায় বা ঈদের মাঠের নিকটবর্তী না হয়'।[৫০] বিদায় হজ্জে আরাফার মাঠে জনসম্মুখে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ 'হে লোকসকল! প্রতি বছর প্রতিটি পরিবারের পক্ষ হতে কুরবানী রয়েছে'।[৫১]

কুরবানী হলো আমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। আর যে কুরবানী করতে সামর্থ্য রাখে তার জন্য এটা পরিত্যাগ করাকে অপছন্দ করা হয়েছে। একটি ছাগল একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট।

কুরবানীদাতার উপর কুরবানীর তিনটি শর্তের প্রতি লক্ষ রাখা ওয়াজিব:

১. পশুর বয়স: উটের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর, গরুর দুই বছর, ছাগল পূর্ণ এক বছর এবং মেষ ও ভেড়ার ক্ষেত্রে নিম্নে ছয় মাস হতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ 'তোমরা মুসিন্নাহ (বয়স) ছাড়া কোনো পশু যবেহ করবে না। হ্যাঁ, যদি তা সংগ্রহ করতে তোমাদের জন্য কষ্ট হয়, তবে মেষ-ভেড়ার জাযাআহ (ছয় মাস বয়সের) যবেহ করতে পার'।[৫২]

২. পশু চারটি দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হতে হবে: উবাইদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু -কে বললাম, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীতে কোন কোন পশু অপছন্দ করতেন বা নিষেধ করতেন, তা আমাকে বলুন। তিনি বলেন,

৫০. মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৭৩; ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৩, 'হাসান'।
৫১. তিরমিযী, হা/১৫১৮, হাদীছ ছহীহ।
৫২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৩; মিশকাত, হা/১৪৫৫।

رَبَّعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي «. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ‘চার প্রকারের পশু কুরবানী করলে তা যথেষ্ট হবে না— ১. অন্ধ পশু, যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট; ২. রুগ্ন পশু, যার রোগ সুস্পষ্ট; ৩. খোঁড়া পশু, যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট এবং ৪. কৃশকায় দুর্বল পশু, যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে’। বর্ণনাকারী উবাইদ (র.) বলেন, আমি শিং ও কানে ত্রুটি থাকাও অপছন্দ করি। বারা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যে ধরনের পশু তুমি নিজে অপছন্দ কর, তা পরিহার করো; কিন্তু অন্যদের জন্য তা হারাম করো না।[৫৩]

৩. কুরবানীর জন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যবেহ করতে হবে: আর তা হলো ঈদের ছালাতের পর হতে ঈদের পরের তৃতীয় দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত *(আল-বাকারা, ২/২০৩)*।

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের কুরবানী করতেন: আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ‘রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ দুই শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের দুটি দুম্বা কুরবানী করেছেন’।[৫৪]

ঈদের দিনের ও কুরবানীর কিছু আদব:

ঈদের দিন নতুন ও পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি লাগানো এবং কুরবানীর ঈদে কিছু না খেয়ে মাঠে যাওয়া: হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجُزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ، وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ‘(কুরবানীর দিনে) আমরা যেন যথাসাধ্য সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরি, যথাসাধ্য সবচেয়ে ভালো সুগন্ধি ব্যবহার করি, যথাসাধ্য সবচেয়ে মোটাতাজা কুরবানী দিই। গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং উট দশ জনের পক্ষ থেকে। আর আমরা যেন তাকবীর সশব্দে বলি এবং প্রশান্তি ও ভদ্রতা বজায় রাখি’।[৫৫]

ঈদের ছালাত শেষে কুরবানীর পশু যবেহ করা: বারা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ‘যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের আগে যবেহ করল, সে নিজের খাবারের জন্যই যবেহ করল। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের পর যবেহ করল, তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো। সে মুসলিমদের নিয়ম অনুসরণ করল’।[৫৬] জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ‘যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের আগে যবেহ করল, সে যেন এর পরিবর্তে আরও একটি যবেহ করে’।[৫৭]

কুরবানীর পশু ঈদের মাঠে যবেহ করাই উত্তম: ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى ‘রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের মাঠে কুরবানীর পশু যবেহ করতেন।[৫৮]

যবেহ করার আগে ছুরি ধার দেওয়া: আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجْهِزْ ‘রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি শানিয়ে নিতে, তা পশুর চোখ থেকে আড়াল করতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে’।[৫৯]

যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া: মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ ‘যার যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না। কেননা তা গর্হিত’ *(আল-আনআম, ৬/১২১)*। কুরবানীর দু‘আ: যেভাবে দু‘আ বলতে হবে, بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَر اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ عَنْ فُلَانْ أَوْ فُلَانَةَ ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা হাযা মিনকা ওয়া লাকা, আল্লাহুম্মা তাকাব্বালহু আন...’। এরপর মনে মনে কুরবানীদাতার নাম নিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরবানীসহ সকল ইবাদত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পালন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৫৩. আবূ দাঊদ, হা/২৪০২; তিরমিযী, হা/১৪৯৭; নাসাঈ, হা/৪৩৭০; ইবনু মাজাহ, হা/৩১৪৪; মিশকাত, হা/১৪৬৫, হাদীছ ছহীহ।

৫৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬; মিশকাত, হা/১৪৫৩।

৫৫. শুআবুল ঈমান, হা/৩৪৪২; মুসতাদরাক হাকেম, হা/৭৫৬০; আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/২৭৫৬।

৫৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬১; মিশকাত, হা/১৪৩৬।

৫৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫০০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬০; মিশকাত, হা/১৪৩৭।

৫৮. ছহীহ বুখারী, হা/৯৮২; আবূ দাঊদ, হা/২৮১১; তিরমিযী, হা/১৪৯৭; নাসাঈ, হা/১৫৮৯; ইবনু মাজাহ, হা/৩১৬১; মিশকাত, হা/১৪৩৮, হাদীছ ছহীহ।

৫৯. ইবনু মাজাহ, হা/৩১৭২; আহমাদ, হা/৫৮৬৪, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

যেসব দিনে ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ*

মূল: ড. আব্দুল আযীম আল-বাদাবী
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন*

আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার সেরা আমল হলো ছিয়াম। কিন্তু বছরে এমন কিছু দিন আছে, যে দিনগুলোতে ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো—

১. দুই ঈদের দিন: ইবনু আযহারের আযাদকৃত দাস আবূ উবায়দা রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ‘আমি একদা ঈদে উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এই দুই দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন—যে দিন তোমরা ছিয়াম ছেড়ে দাও তথা ঈদুল ফিতরের দিন এবং যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও’।[৬২]

২. তাশরীকের দিন:[৬৩] উম্মু হানী রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর আযাদকৃত দাস আবূ মুররাহ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ كُلْ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ‘একদা তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের সাথে তাঁর পিতা আমর ইবনুল ‘আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট যান। তিনি তাদের উভয়ের সামনে খাবার এনে তা খেতে বললেন, আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি ছিয়ামরত আছি। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দিনগুলোতে আমাদেরকে ছিয়াম ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন’। মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘তা হলো তাশরীকের দিনগুলো’।[৬৪] আয়েশা ও ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ ‘যার নিকট কুরবানীর পশু নেই, তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে আইয়্যামে তাশরীকে ছিয়াম পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি’।[৬৫]

৩. শুধু জুমআর দিন ছিয়াম পালন করা: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ ‘তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যেন শুধু জুমআর দিনে ছিয়াম পালন না করে, জুমআর পূর্বের দিন বা পরের দিন ছিয়াম না রেখে’।[৬৬]

৪. শুধু শনিবার ছিয়াম পালন করা: আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর রহিমাহুল্লাহ হতে তার বোন (আছ-ছামাই) সূত্রে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ‘তোমাদের উপর ফরযকৃত ছিয়াম ব্যতীত তোমরা শনিবারে আর অন্য কোনো ছিয়াম পালন করো না। আঙুরের লতার বাকল বা গাছের ডাল ব্যতীত তোমাদের কেউ যদি আর কিছু না পায় (সেদিনের আহারের জন্য), তবে সে যেন তাই চিবিয়ে নেয় (ছিয়াম ভাঙার জন্য)’।[৬৭]

৬০* শায়খ আব্দুল আযীম বাদাবী প্রণীত ‘আল-ওয়াজীয ফী ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযীয’ বই থেকে সংগৃহীত।

৬১* প্রিন্সিপ্যাল, দারুস সালাম ইসলামী কমপ্লেক্স, পিরুজালী ময়তাপাড়া, গাজীপুর।

৬২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৭; আবূ দাঊদ, হা/২৪১৬; তিরমিযী, হা/৭৭১।

৬৩. أيام التشريق বা তাশরীকের দিন অর্থাৎ কুরবানীর দিন (১০ জিলহজ্জ)-এর পরবর্তী দিনগুলো। এগুলো দুই না তিন দিন, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এগুলোকে তাশরীকের দিন বলা হয়, কারণ এই সময় কুরবানীর পশুর গোশত সূর্যের আলোয় থাকে। আরো বলা হয়েছে, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কুরবানীর পশু যবেহ করা হয় না। আরো বলা হয়েছে যে, ঈদের ছালাত সূর্যোদয়ের সময় পড়া হয়। আরও বলা হয়ে থাকে, তাশরীক অর্থ হলো প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর তাকবীর বলা *(ফাতহুল বারী, ৪/২৮৫)*।

৬৪. আবূ দাঊদ, হা/২৪১৮, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৬৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৯৭-১৯৯৮।

৬৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৪; আবূ দাঊদ, হা/২৪২০; তিরমিযী, হা/৭৪৩, শব্দ বিন্যাস তারই; ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৩।

৬৭. আবূ দাঊদ, হা/২৪২১; তিরমিযী, হা/৭৪৪, শব্দ বিন্যাস তারই; ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৬; মিশকাত, হা/২০৩৬, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ

৫. যার শা'বান মাসে ছিয়াম পালন করার অভ্যাস ছিল না, তার জন্য শা'বান মাসের শেষার্ধে (অর্থাৎ ১৫ শা'বানের পর থেকে) ছিয়াম পালন করা অপছন্দনীয়: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا 'শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হলে তোমরা (নফল) ছিয়াম রাখবে না'।[৬৮] উক্ত বর্ণনাকারী (আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে অনুরূপভাবে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ 'তোমরা কেউ রামাযানের একদিন কিংবা দুদিন পূর্ব হতে ছিয়াম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে সেদিন ছিয়াম পালন করতে পারবে'।[৬৯]

৬. সন্দেহের দিন ছিয়াম পালন করা: আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ 'যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দিনে[৭০] ছিয়াম পালন করল, সে আবুল কাসেম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবাধ্যতা করল'।[৭১]

৭. সারা বছর ছিয়াম পালন করা, যদিও নিষিদ্ধ দিনগুলোতে ছিয়াম না রাখে: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেলেন, يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهَكَتْ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ 'হে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর! তুমি তো একাধারে ছিয়াম পালন করে যাচ্ছ। সারা রাত ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক। তুমি এরূপ করলে তাতে তোমার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। যে ব্যক্তি সর্বদা ছিয়াম পালন করল, সে মূলত ছিয়াম পালন করল না'।[৭২]

আবূ ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ 'একদা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কীভাবে ছিয়াম রাখেন?' এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু তা দেখতে পেয়ে বললেন, 'আমরা আল্লাহকে আমাদের রব, ইসলামকে আমাদের দ্বীন এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমাদের নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আমরা আল্লাহর নিকট তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই'। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু উক্ত বাক্যটি বারবার বলতে লাগলেন, এক পর্যায়ে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসন্তুষ্টির ভাব দূরীভূত হলো। এরপর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ওই ব্যক্তি কেমন, যে সারা বছর ছিয়াম পালন করে? তিনি বললেন, 'সে ছিয়াম পালন করেনি এবং ছিয়াম ভঙ্গও করেনি'।[৭৩]

৮. স্বামী উপস্থিত থাকলে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল ছিয়াম পালন করা নিষেধ: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ 'কোনো স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত নফল ছিয়াম রাখবে না'।[৭৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, ছিয়াম অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত দিনগুলোতে ছিয়াম না রাখাই সুন্নাহ। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সুন্নাহ মোতাবেক আমল করার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

বলেছেন। এ হাদীছের ব্যাপারে কথা আছে *(ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ 'বাংলা', ৪/২৪০, টীকা নং ৬১২)*।

৬৮. আবূ দাঊদ, হা/২৩৩৭, শব্দ বিন্যাস তারই; তিরমিযী, হা/৭৩৮; ইবনু মাজাহ, হা/১৬৫১, সমার্থক শব্দ; মিশকাত, হা/১৯৭৪, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৬৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৯১৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮২; আবূ দাঊদ, হা/২৩২৭; তিরমিযী, হা/৭৩৮; নাসাঈ, হা/২১৭৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৬৫০।

৭০. শা'বান মাসের ২৯ তারিখ চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ তারিখ ছিয়াম রাখা এ সন্দেহে যে, হয়তো রামাযানের চাঁদ উঠেছে। -অনুবাদক

৭১. ইরওয়াউল গালীল, হা/৯৬১; তিরমিযী, হা/৬৮৬; আবূ দাঊদ, হা/২৩৩৪; নাসাঈ, হা/২১৮৮; ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪৫; মিশকাত, হা/১৯৭৭, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৭২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৭৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।

৭৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯; আবূ দাঊদ, হা/২৪২৫, শব্দ বিন্যাস তারই; নাসাঈ, হা/২৩৮১।

৭৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫১৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/১০২৬; আবূ দাঊদ, হা/২৪৫৮; তিরমিযী, হা/৭৮২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৬১ 'এতে অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে'।

www.al-itisam.com

কুরবানীর পশুর হাটে সতর্কতা প্রয়োজন

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

কুরবানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করতে হয়। ঈদুল আযহার দিন থেকে অর্থাৎ ১০ যিলহজ্জ থেকে ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কুরবানীর দিনগুলোতে নির্দিষ্ট ধরনের গৃহপালিত পশু যবেহ করাই হচ্ছে কুরবানী।

ঈদুল আযহার আমেজ আসে কুরবানীর পশুর হাট ঘিরে। পরিবারের সদস্যরা মিলে হাটে যাওয়া, দরদাম করে পশু কিনে বাড়ি ফেরা, পথে মানুষের জিজ্ঞেস করা— এসব আলাদা মাত্রা যোগ করে ঈদের আমেজে।

নিজের পছন্দে নিজেই কিনে আনে বলে কুরবানীর হাট কিংবা বাজার অন্য অনেক বাজার থেকে আলাদা। কাজেই এ বাজারে পুরাতন বিক্রেতার সাথে নতুন ক্রেতার দেখা হয়, পুরাতন দালালের সাথে নতুন ক্রেতার ভণিতার সখ্য হয়। গরু পৌঁছে দেওয়ার সহকারীর কাছে একশ টাকা থেকে হাজার টাকার দফারফায় লক্ষ টাকার গরু বা পশু তুলে দিতে হয়। তাই কানকে খরগোশের মতো খাড়া করে, চোখকে মাছির মতো সচল রেখে বাজারে বা হাটে ঢুকতে হয়। অস্থায়ী মানুষের অস্থায়ী হাট ক্ষণস্থায়ী বলে পদে পদে বিপদ সাথে সাথে ঘুরে। এজন্যই এ বাজারে অধিক সতর্কতার সাথে পশু কিনতে হয়। চোখকে টর্চলাইট, কানকে অ্যান্টেনা, মনকে রাডার বানিয়ে চলতে হয়।

যদিও কুরবানী ভালো ও সুস্থ পশু ছাড়া হয় না। তাই নতুন ক্রেতা পুরাতন বিক্রেতার কাছে যায় এবং ফাঁদ পাতা জালে আটকা পড়ে বেশি। সারা বাংলাদেশে আবার ব্যবসায়ী ক্যাটাগরিতে দুই ধরনের কাস্টমার বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এর একজন বিদেশ থেকে ডলার, পাউন্ড নিয়ে আগত; আবার অন্যজন ভাই, বোন বা আত্মীয়-পরিজনের টাকায় পশু কিনতে আগত কাস্টমার। বিক্রেতারা এ দুই ধরনের কাস্টমারকে গুরুত্ব বেশি দিয়ে আবার দুই ধরনের দাম হাঁকায়। বিদেশিকে পশুর দাম থেকে ৩ থেকে ৫ গুণ বাড়িয়ে বলে অনড় থাকা। আবার বিদেশি টাকায় দেশি কাস্টমারকে ৩ থেকে ৪ গুণ দাম বাড়িয়ে বলা হয়। দেখা গেছে, যিনি ডলার বা পাউন্ড নিয়ে এসেছেন, তিনি পাউন্ড বা ডলারকে চোখ বুজে টাকায় রূপান্তর করে বেশ সস্তায় কিনতে পারছেন মনে করে বেশি দামে কেনেন। আবার পরের ধনে পোদ্দারি করা কাস্টমার, বেশি দরদাম না করেই পশু কিনে নেন। তারা পশুর দাম যাচ্ছেতাই হাঁকাতে শুরু করে এবং আটকে দেয় তাদের, যারা ঘুষের টাকা গরীব মারার টাকায় কিনতে আসেন না।

বাজারের নিয়মিত পদ্ধতি হচ্ছে আপনি যা কিনতে যাচ্ছেন, তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে যাওয়া। এতে যদি কোনো রাস্তা না থাকে, তাহলে একজনের কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দাম করে না কিনে বাজারে দরদাম যাচাই করে কেনা। ফলমূল, তরিতরকারি, আসবাব কিংবা জমি কেনার মতো কিনতে কিনতে ক্রেতা হওয়ার মতো বাজারে অভিজ্ঞ ক্রেতা সেজে ঢুকুন, তাহলে ঠকবেন না। ইদানীং বাজারে 'মোটাতাজা পশু' কথাটি বেশ প্রচলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ ছাড়াই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশু মোটাতাজা করে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। দেখা গেছে, এভাবে কৃত্রিমভাবে মোটাতাজা করা পশুর মাংস খেয়ে কুরবানীর দিনেই অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই মোটাতাজা পশু কিনতে চাইলে অবশ্যই ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিনুন।

পশুর হাট বা বাজারের হালচাল ভালো থাকে না। দেখা গেছে বিক্রেতা পশু বিক্রি করে ফেলেছেন, ক্রেতা জাল নোট ধরিয়ে দিলেও দিতে পারে। তাই বিক্রেতার কাছে পশু হস্তান্তরের পূর্বে হাটে কিংবা পশুর বাজারে অবস্থিত ব্যাংকের অস্থায়ী বুথে জাল নোট শনাক্ত করে টাকাগুলো গুনে, বুঝে তারপর পশু হস্তান্তর করুন। মনে রাখবেন, যারা জাল নোট বহন করে, তারা মারাত্মক অপরাধী। এদেরকে পুলিশের হাত ছাড়া কারো হাতে দেবেন না।

অননুমোদিতভাবে রাস্তাঘাট, ফুটপাত, খেলার মাঠ কিংবা রাস্তায় চলমান বিক্রেতার কাছ থেকে পশু কিনবেন না। এতে অবৈধভাবে বর্ডার পার করা, কারো জমি থেকে হারিয়ে যাওয়া, গোয়াল ঘর থেকে খোয়া যাওয়া পশুও কিনে ফেলতে পারেন। কাজেই অনুমোদিত পশুর হাট বা বাজার থেকে পশু কিনুন।

অনেক সময় ক্রেতার সরলতার সুযোগ নিয়ে বিক্রেতারা পশুর শরীরে কৃত্রিম রং মাখিয়ে, বয়স লুকিয়ে, পশুর দাঁত প্রদর্শন না করে, নেশা খাইয়ে পশুর পায়ে প্যারেক গেঁথে, লেজে আলপিন মেরে, অসুস্থ পশুর শরীরে চিরুনি দিয়ে বিক্রি করতে পারে। তাই ত্রুটিগুলো পরখ করে, অসুস্থ কি-না যাচাই করে এবং মলত্যাগের রাস্তা পরখ করে কিনতে হবে।

বাজারের হালচালে আরেকটি বড় অবৈধ উৎপাত হলো দালালদের দৌরাত্ম্য। অনেক সময় পুরো বাজারই যেন তাদের দাপটে চলে। লক্ষ করলে দেখবেন, কোনো একজন লোক

৭৫* চিকিৎসক, কলামিষ্ট ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

কখনো আপনার পক্ষে, আবার কখনো বিক্রেতার পক্ষে কথা বলছে, তখন বুঝে নেবেন সে আসলে কোনো পক্ষের নয়; সে এখানকার দালাল। আবার কখনো কয়েকজনকে ক্রেতা সাজিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয় যে, আপনার করা দামের চেয়ে বেশি দামে পশু কিনতে হচ্ছে। তখন বুঝে নিতে হবে, এরা আসলে ফড়িয়া বা দালাল চক্রের লোক।

অনেকে কেনা পশু বাসা-বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাহায্যকারী নেন। কিন্তু সাহায্যকারীর কোনো পরিচয় রাখেন না। এক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন হয়তো ফাঁকফোকরে আপনার পশু খোয়া যেতে পারে। তাই সাহায্যকারী নেওয়ার পূর্বে সাহায্যকারীর আসল পরিচয় জানতে তার রেজিস্ট্রেশনকৃত মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম সনদের কপি রাখুন। একান্ত অপারগ হলে হাতে থাকা ক্যামেরাযুক্ত মোবাইলে ছবি তুলে রাখুন। সম্ভব হলে হাঁটুন তার সাথে সাথে।

পশু ক্রয় করতে গেলে সাথে টাকা থাকে, তা অন্ধ চোর বা কানা ছিনতাইকারীও জানে। কাজেই সতর্ক থাকুন। পাশাপাশি না হেঁটে পাশের জনকে নিয়ে ভিড়ে ভিড়ে আগে পিছে করে হাঁটুন। কাউকে সন্দেহ হলে এবং সন্দেহ নিশ্চিত হলে পুলিশ কিংবা ভালো পথিককে জানিয়ে রাখুন। পাশের জন যাকে আপনি সাথে এনেছেন, তাকে আপনার পেছনে গিয়ে আপনাকে চোখে চোখে রাখতে বলুন। সাবধানে টাকা রাখুন। সাধু বেশে চোর, ভদ্রবেশী ছিনতাইকারী, মিষ্টভাষী কপট মানুষ এখন পায়ে পায়ে হাঁটে। পশু কিনে বা ক্রয় করে রশিদ নিন। মনে রাখবেন, রশিদ হচ্ছে নিরাপত্তা পাস। মনে রাখবেন, যে রশিদটি নিচ্ছেন তার মধ্যে ক্রেতার ও বিক্রেতার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম সনদ নম্বর থাকে। আরো থাকে ক্রয়কৃত পশুর বিবরণ ও হাট বা বাজারের নাম। কাজেই চোরাই পশু কেনার হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার এটিও এক মোক্ষম সুযোগ। একে হাতছাড়া করতে নেই।

কেনার পর পশুর গলায় বাঁধা দড়ি পরীক্ষা করবেন, দড়িটি শক্ত কি-না। মাথা থেকে দড়ি বের হয়ে যাচ্ছে কি-না। পাটের দড়ি হলে ভালো। নাইলনের দড়ি হলে টানতে টানতে পশুটি ফাঁস লাগল কি-না নজর দিবেন। তবেই হয়তো দড়িটি নিরাপত্তার কাজে বেশি সহযোগিতা করতে পারে। নতুবা দড়ি ছিঁড়ে লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার মতো পশুর কথাও অনেকে বলে থাকেন।

এবার আসুন, অন্য আরেক কথা বলি— রাস্তার ধারে, অনুপযুক্ত স্থানে, ময়লা ড্রেনের পাশে পশু যবেহ করবেন না। যেখানে সেখানে যবেহকৃত পশুর রক্ত, নাড়িভুঁড়ি ফেলবেন না। রক্ত পরিষ্কার করুন। আবর্জনা মাটির নিচে পুঁতে দিন।

বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় এবারও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে গবাদিপশু বিক্রয় কার্যক্রম চলবে। এক্ষেত্রে অনলাইনে প্রতারণা রোধে অনলাইনে আপলোড করা পশুর মালিকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, পশুর বয়স, ওজন, মূল্য ও ছবি সংযোজন করতে হবে। মনে রাখবেন, কুরবানীর পশু মূলত নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করার জন্য হলেও এর মাংসের প্রতি গরীব-দুঃখী ও আত্মীয়স্বজনেরও প্রত্যাশা থাকে। তাই তাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করা কখনোই উচিত নয়।

পশুর যেসব দোষ থাকলে কুরবানী হবে না:

কুরবানীর পশু বড় ধরনের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘চার ধরনের পশু, যা দিয়ে কুরবানী জায়েয হবে না— অন্ধ, যেটার অন্ধত্ব স্পষ্ট; রোগাক্রান্ত, যার রোগ স্পষ্ট; পঙ্গু, যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট এবং আহত, যার কোনো অঙ্গ ভেঙে গেছে’।[৭৬]

স্বাস্থ্য পরামর্শ:

হাটে গেলে মাস্ক পরা: হাটে গেলে মাস্ক ব্যবহারের চেষ্টা করুন। হাটে সাধারণত অনেক মানুষের সমাগম হয়, ফলে সেখানে রোগজীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে হাটে যাওয়ার সময় মাস্ক পরার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সঙ্গী হোক স্যানিটাইজার: হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকলে কিছুক্ষণ পরপর হাত ধুয়ে নিন। অন্যথা স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। হাট থেকে বের হওয়ার সময় হাত জীবাণুমুক্ত করুন। বাসায় ঢুকে অন্যদের সঙ্গে মেলামেশার আগে সাবান মেখে গোসল সেরে ফেলুন।

গরমে পানির বোতল: এবার প্রচণ্ড গরমের মাঝে হাটে যেতে হবে। দীর্ঘ সময় গরমের মাঝে অবস্থান করলে পানিশূন্যতা হতে পারে। সেজন্য হাটে গেলে বোতলে করে প্রয়োজনীয় নিরাপদ পানি সঙ্গে রাখুন। বিক্রেতা হিসেবে যারা দীর্ঘ সময় হাটে অবস্থান করছেন, তাদের অবশ্যই এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পায়ের যত্ন নিন: গোবর, চোনা, কাদা একাকার হয়ে প্রায়ই হাট নোংরা হয়ে থাকে। হাটে খালি পায়ে হাঁটা অনুচিত। যাদের পায়ের ক্ষত রয়েছে কিংবা যারা ডায়াবেটিস রোগী, তাদের হাটে না যাওয়াই উত্তম। হাটে গিয়ে পা থ্যাঁতলে বা কেটে কাদা, গোবর ইত্যাদি লেগে গেলে অবশ্যই সাবান দিয়ে পা ধুয়ে অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগাতে হবে। অবস্থা অনুযায়ী টিটেনাসের ভ্যাকসিন নিতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, কুরবানীর পশুর হাটে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই, এটাই শেষ কথা। সবার জীবনে আনন্দময় ঈদ আসুক এই প্রত্যাশা।

৭৬. ইবনু মাজাহ, হা/৩১৪৪।

ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার সংঘাত

-সায়্যিদ তানভীর নদবি*

সৃষ্টির শুরু করে আজ পর্যন্ত সত্য ও মিথ্যার সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যেক যুগে বিরোধী পক্ষ ও শত্রুরা অনিষ্ট ছড়িয়েছে। প্রতিটি জাতি ও সম্প্রদায়ে এমন অদূরদর্শী ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, যারা সত্যের প্রচার ও কল্যাণের বিজয়ের সাথে জন্মগত শত্রুতা পোষণ করে। তবে বর্তমান সময়ে যে ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপকতা লাভ করেছে, এটি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র এবং ইসলামবিদ্বেষ ও মুসলিমদের প্রতি চিরন্তন শত্রুতা ও ঘৃণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সম্ভবত এটি সেই মানসিক, চিন্তাগত ও ব্যবহারিক ধর্মত্যাগ, যা প্রথমে মানুষের বাহ্যিক স্বভাবকে প্রভাবিত করে এবং তার অন্তর থেকে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ কেড়ে নেয়। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এটি এমন একটি ধর্মত্যাগ, যার (প্রতিহত করার) জন্য কোনো আবূ বকর নেই। আমরা বুঝতেই পারছি না যে, আমরা একটি স্পষ্ট চিন্তাগত, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত ধর্মত্যাগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, যেখান থেকে ফিরে আসার পথ অনেক দূরে চলে গেছে এবং সবাই এটিকে অবহেলা করছে। যদি আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে বুঝতে পারব যে, আমাদের মধ্যে সকাল-সন্ধ্যায় পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। বিশ্বের সকল ধর্মেই পশ্চিমা নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার ঢেউ লক্ষ করা যায়। এমনকি ধর্মের প্রভাব মানুষের মধ্যে শুধু নামেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, বাকি সব রীতিনীতি, ইবাদত, নৈতিকতা ও সামাজিকতা পশ্চিমা সভ্যতার কাছে বলি হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের সমাজের এলিট শ্রেণি পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাও এই শ্রেণির হাতে রয়েছে, যার কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ পশ্চিমা (ইউরোপীয়) সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলছে। যদি এই ধর্মত্যাগের দিকে অবিলম্বে মনোযোগ না দেওয়া হয় এবং যদি এটি এভাবেই চলতে দেওয়া হয়, তবে খুব শীঘ্রই অধিকাংশ মানুষের ইসলামের প্রতি আবেগপ্রবণতা ও আকর্ষণ শেষ হয়ে যাবে।

পশ্চিমা সভ্যতা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের নাম নয়, যা ইলাহী প্রদত্ত শিক্ষার দাবি করে। বরং পশ্চিমা সভ্যতা বা পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শন হলো এমন একটি চিন্তা ও বিশ্বাসের নাম, যা প্রত্যেককে তাদের নিজস্ব ধর্ম অনুসরণ করার অনুমতি দেয় ব্যক্তিগত জীবনে; কিন্তু বিশেষ চিন্তাধারা, আক্বীদা-বিশ্বাস এবং অহীভিত্তিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে না। কারণ পশ্চিমা দৃষ্টিকোণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা, এক্ষেত্রে পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও প্রীতি তার অধিকার। সে তার কাজের জন্য অন্য কারো কাছে জবাবদিহি করে না। তাই বস্তুবাদ (Materialism), অর্থপূজা (Money-Worship) ও সম্পদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি:

পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল— (১) স্বাধীনতা, (২) সমতা ও (৩) উন্নতি। এই তিনটি বিষয়ের উন্নতিকে পথচলার সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর প্রতি সমর্থন করা হয় এবং এগুলোর উপর জোর দেওয়া হয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তা আইন বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দূর করা হয়। এই তিনটি বিষয়কে মাথায় রেখে পশ্চিমা বিশ্ব একটি সার্বজনীন আইন প্রণয়ন করেছে, যার নাম 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র'। এই ঘোষণাপত্রের প্রতি সকল দেশকে বাধ্য করা হয়েছে এবং প্রতিটি দেশের জন্য এটি মেনে চলা অপরিহার্য।[৭৮]

ইসলামী সভ্যতা ও পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য:

(১) ইসলামে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল এবং কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম— এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নির্দেশই চূড়ান্ত। ব্যক্তি স্বয়ং কোনো কিছুকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করার স্বাধীনতা রাখে না। যেমন- ব্যভিচার হারাম নাকি হালাল? সূদ নেওয়া-দেওয়া হালাল নাকি হারাম— এসব নির্ধারণ করবেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মানুষের হাতে তুলে দেয়। তাদের মতে, সবকিছুর কর্তৃত্ব মানুষের হাতে রয়েছে। মানুষ যা সঠিক বলে ঘোষণা করবে, তা সঠিক

৭৭* সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৭৮. তথ্যসূত্র: তাআরুফ তাহযীবে মাগরীব আওর ফালসাফায়ে জাদীদ।

আর যা ভুল বলে ঘোষণা করবে, তা ভুল। সঠিক ও ভুলের মাপকাঠি মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেমন- ব্যভিচার করা সঠিক নাকি ভুল? সমকামিতা মানুষের অধিকার নাকি নিকৃষ্টতম কাজ? সূদ নেওয়া জায়েয নাকি হারাম? এসব সিদ্ধান্ত মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে নির্ধারণ করা হবে।

(২) ইসলামের পথনির্দেশনা দেওয়া হয় মুহাম্মাদ a-এর শরীআতের মাধ্যমে, অন্যদিকে পশ্চিমা দর্শন ও চিন্তাধারায় পথনির্দেশনার জন্য নবী-রাসূল বা কোনো ইলাহী গ্রন্থের প্রয়োজন নেই; বরং এতে মানুষ কেবল নিজের বুদ্ধি ও যুক্তির অনুসরণ করে।

(৩) ইসলামের আইন শরীআত থেকে গৃহীত হয়, অন্যদিকে পশ্চিমা মতাদর্শ ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুযায়ী আইন তৈরি করে মানুষের নির্বাচিত একটি দল তথা পার্লামেন্ট।

(৪) ইসলামী দৃষ্টিকোণে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা হলো, আল্লাহ এক, তিনি চিরন্তন এবং চিরকাল থাকবেন। মুসলিমরা এই এক স্রষ্টা ও মালিকের অনুগত, যিনি মানুষ ও সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে পশ্চিমা সভ্যতা আল্লাহ ও ধর্মকে অস্বীকারের পরে বস্তুকে তাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের মতে, বস্তু চিরন্তন, চিরকাল থাকবে এবং তারা তাদের বুদ্ধি ও চেতনার ভিত্তিতে বস্তু সৃষ্টি করে।

(৫) ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব হলো অহী। অহীর তুলনায় মানুষের সৃষ্ট কোনো জ্ঞানই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে না। অন্যদিকে পশ্চিমা সভ্যতায় বুদ্ধি ও যুক্তিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়। এই কারণে তারা জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে মিথ্যা বলে এবং প্রতিদান, শাস্তি ও অনুরূপ অন্যান্য বিশ্বাসকে সরাসরি অস্বীকার করে। এই কারণেই পশ্চিমারা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নয়, কারণ ধর্মকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় না; বরং ঈমান ও বিশ্বাসের বিষয় শুধু অহীর জ্ঞানের মাধ্যমেই বুঝা যায়।

(৬) ইসলামে ইবাদতের উদ্দেশ্য এবং মানুষের প্রচেষ্টার ফলাফল হলো মুসলিমদের জন্য আখেরাতে সাফল্য এবং জান্নাত লাভ করা। অন্যদিকে পশ্চিমা সভ্যতা শুধু বস্তুগত উন্নতিকে সাফল্য হিসেবে মনে করে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে যত বেশি বস্তুগত উন্নতি করেছে, তাকে সবচেয়ে সফল মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধারণা এতটাই সাধারণ হয়ে গেছে যে, আজ সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি শিক্ষিতরাও ধনসম্পদ এবং বৈশ্বিক উন্নতিকে সাফল্য হিসেবে মনে করে বসে আছে।

(৭) ইসলামী সভ্যতায় মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টির সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এমনকি একজন মুমিন-মুসলিমের মর্যাদাকে কা'বাঘরের মর্যাদার চেয়েও বেশি বলা হয়েছে।[৭৯] অন্যদিকে পশ্চিমা সভ্যতা মানুষকে কখনও প্রাণীর চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়নি।

পশ্চিমা সভ্যতা অনুযায়ী, রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষ একটি রাজনৈতিক প্রাণী, অর্থনীতিতে একটি অর্থনৈতিক প্রাণী, মনোবিজ্ঞানে মানুষ কিছু নির্দিষ্ট প্রবৃত্তির সমষ্টি এবং জীববিজ্ঞানে মানুষ শুধু একটি জৈবিক অস্তিত্ব। এই সভ্যতা মানুষকে বস্তুবাদ থেকে উপরে উঠতে দেয়নি এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটির কারণে সমগ্র মানবজাতি বস্তুবাদের আগুনে পুড়ছে।

এই মৌলিক পার্থক্যগুলোই ইসলামী বনাম পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বুঝতে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির শব্দগুলোকে খুবই অগভীর অর্থে ব্যবহার করি। পশ্চিমা সভ্যতা বলতে আমরা শুধু প্যান্ট-শার্ট, টাই পরা ও ক্লিন শেভ করা ইত্যাদিকেই বুঝি অথবা শুধু অশ্লীলতা ও নগ্নতার বহমান ধারাকেই পশ্চিমা সভ্যতা হিসেবে ধরে নিই। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। অবশ্যই সভ্যতাকে পোশাক, চালচলন, সাজসজ্জা দিয়েও বিচার করা যায়, কিন্তু সভ্যতার স্তর শুধু পোশাক এবং চালচলনেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর মৌলিক ভিত্তি ও আদর্শ রয়েছে, যা সঠিকভাবে বুঝলে তবেই এই সভ্যতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

পশ্চিমা সভ্যতার হৃদয় ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি:

পশ্চিমা বিশ্বে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রসারিত করার জন্য এবং ইসলামবিদ্বেষ ও মুসলিমবিদ্বেষের লক্ষ্যকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিপজ্জনক কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে—

(১) তারা সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে অর্থের লোভ এবং চাকরির প্রস্তাব দিয়ে বিভিন্ন স্থানে খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোতে পশ্চিমারা এমন একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করেছে, যা শিক্ষার্থীদের ধর্ম থেকে বিরূপ করে তোলে এবং ধর্মহীনতাকে প্রাধান্য দেয়। যেখানে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা ধর্মের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করে বলে যে, প্রথমে ধর্ম ছিল না, ধর্ম পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছে, পরকাল বলে কিছু নেই, বাস্তব জগৎই আসল আর ধর্ম হলো একটি ব্যক্তিগত বিষয়,

৭৯. তিরমিযী, হা/২০৩২, হাসান-ছহীহ।

www.al-itisam.com

এতে বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা পশ্চিমা লোকদেরকে সভ্য এবং মুসলিমদেরকে অসভ্য হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তারপর ধীরে ধীরে ইসলামী ধারণাগুলোকে পশ্চিমা ধারণার অধীন করে উপস্থাপন করা শুরু করে, অহীকে অস্বীকার করে এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে সত্য ও সঠিকতার মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর তারা শিক্ষার্থীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে যে, ধর্ম বিশ্বের উন্নতির জন্য একটি বাধা, আলেম ও ধর্ম পালনকারীরা সবাই নিচু মানের মানুষ। তারা এই ধারণা উপস্থাপন করে যে, ইসলাম বর্তমান যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং তাদের ন্যারেটিভ হলো যে, উন্নতির পুরো ভিত্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে।

(২) তাদের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো দরিদ্রদের মধ্যে কল্যাণমূলক আর্থিক সাহায্য করা এবং তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে মুরতাদ করা। শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত ব্যক্তিরা এর শিকার হয়েছে।

(৩) তাদের তৃতীয় পদ্ধতি ছিল মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন- অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ইত্যাদিতে পাঠানো হবে। তারপর তাদের মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করা হবে এবং তাদেরকে শেখানো হবে যে, সূদ উন্নতির জন্য অপরিহার্য (নাঊযুবিল্লাহ), ছালাতের জন্য সময় বের করা সময় নষ্ট করার সমতুল্য (নাঊযুবিল্লাহ), যাকাত ও ট্যাক্স একই জিনিস। আরও শেখানো হবে যে, কুরবানী, হজ্জ ও উমরাতে ব্যয় করা অযথা অর্থ খরচ করার শামিল; বরং গরীব ও বিধবাদের সাহায্য করা অনেক ভালো। রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। ফ্যাশন সময়ের দাবি এবং পর্দা ও পোশাক ব্যবহারে নারীঅধিকার নিশ্চিত করা হবে, এতে কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না, এখন তোমরা স্বাধীন। অর্থাৎ তাদেরকে বিলাসিতা ও ভোগবাদের প্রতি অভ্যস্ত করে তোলা হবে। তারপর যখন তাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়ে যাবে, তখন অর্থ ও সম্পদের মাধ্যমে দেশের নেতৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তাদেরকে নিজেদের হাতিয়ার বানিয়ে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে কাজে লাগানো হবে।

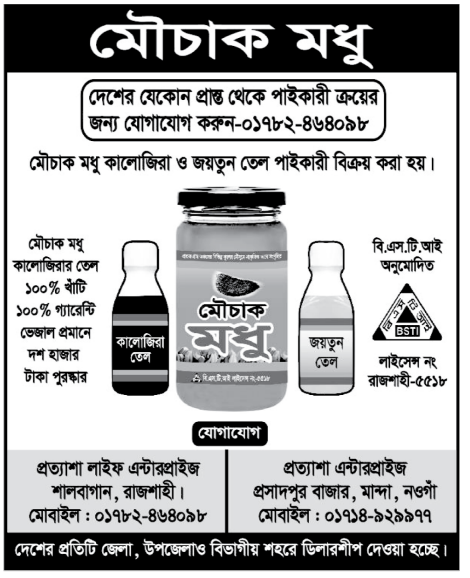
(৪) পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রচারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে মিডিয়া, যার মাধ্যমে অশ্লীলতা, নগ্নতা ও ধর্মহীনতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন সব চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ধার্মিকদের উপহাস করা হয়েছে, সংগীত ও নাচকে আত্মার খাদ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা নৈতিকতা ধ্বংস এবং ধর্মহীনতা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

আশার আলো:

সংক্ষেপে বলতে গেলে শিক্ষার নামে ধর্মহীনতা, সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা এবং মিডিয়ার নামে উলঙ্গতা ছড়ানো হচ্ছে এবং আমাদের সকাল-সন্ধ্যা এতেই কাটছে। এখনও সময় আছে মুসলিমরা জাগ্রত হোক এবং বুঝে নিক যে, আসল ঠিকানা পরকাল; দুনিয়া নয়। প্রাধান্য যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি, পদমর্যাদা নয় এবং লক্ষ্য হলো দ্বীন, দুনিয়া নয়। এখনও আশার আলো অবশিষ্ট আছে। আলী নদভীর ভাষায়, এই বৈশ্বিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য মুসলিম উম্মাহর বর্তমান ধ্বংসাত্মক অবস্থায় একটি মহান বিপ্লব সৃষ্টির জন্য দ্বীনের দাঈদের পশ্চিমা শিক্ষিত শ্রেণির দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। কারণ এই শ্রেণির ভ্রষ্টতাই সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে মানসিক ধর্মত্যাগের ঝুঁকিতে ফেলেছে। মুসলিম দেশগুলোকে নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে সম্পূর্ণ পশ্চিমা সংস্কৃতির দিকে ধাবিত করে দিয়েছে এবং জনগণকে বাকশক্তিহীন পশুপালের মতো অনৈসলামী নেতৃত্বের হাতে সোপর্দ করেছে। তাদের সংশোধনের মাধ্যমে পুনরায় এই দেশগুলোকে পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।[৮০]

যদি এই ধর্মহীনতা ও ধর্মত্যাগের ঢেউ থেকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে বাঁচাতে চান; তবে আল্লাহর জন্য পশ্চিমাদের এই ষড়যন্ত্রগুলো বুঝুন এবং তাদের চকচকে দুনিয়ার পথগুলো এড়িয়ে চলুন, যে পথে রয়েছে অপূরণীয় বিপদের পূর্বাভাস। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

৮০. তথ্যসূত্র: মাগরিবি মামালিক মে ইসলামিয়্যাত অওর মাগরিবিয়্যত কী কাশমাকাশ।





হারামাইনের মিম্বার থেকে

দু'আ: আদব, আহকাম ও ফযীলত

[১৮ শা'বান, ১৪৪৭ হি. মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ খালেদ আল-মুহান্না** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন **ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর, আজকের আলোচনা এমন এক ইবাদত সম্পর্কে, যা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন। যে সম্পর্কে তিনি তাঁর মহান কিতাবে আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর সম্মানিত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ যাকে কল্যাণ দিতে চান, তাকে এই ইবাদতের পথে পরিচালিত করেন, এর দিকে পথনির্দেশ করেন এবং এর দ্বারসমূহ তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে সে এর ছায়াতলে প্রশান্তি লাভ করে, এর প্রাঙ্গণে নফসের নেয়ামত অনুভব করে এবং এর আশ্রয়ে মুক্তি ও স্বস্তি খুঁজে পায়।

এটি এমন এক ইবাদত, যার সাথে রাসূলগণ ও নবীগণ সর্বদা সম্পৃক্ত ছিলেন এবং যার উপর নেককার ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ নির্ভর করেছেন। ফলে তারা এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করেছেন, এর মাধুর্য আস্বাদন করেছেন এবং এর বরকত প্রত্যক্ষ করেছেন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! দু'আ হলো ইবাদতের মূল, এটি শুধু ইবাদতের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট প্রকাশ নয়; বরং দু'আই প্রকৃত ইবাদত। কারণ দু'আর প্রকৃত অর্থ হলো আল্লাহর নিকট নিজের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই এই মর্মে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্ভরহীন ঘোষণা করা। আর এটিই প্রকৃত বন্দেগীর বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া দু'আর মধ্যে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার অর্থও নিহিত আছে এবং তাঁর প্রতি দানশীলতা ও অনুগ্রহের গুণ আরোপ করার বিষয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'আই হলো ইবাদত'। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করেন, 'আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(গাফির, ৪০/৬০)*।[৮১]

বান্দা যখন একমাত্র তার রবের কাছেই দু'আ করে, তখন সেটিই তার বিশুদ্ধ তাওহীদপন্থি হওয়ার পরিচায়ক। এটি তার রবের প্রতি ভালোবাসা এবং স্রষ্টার প্রতি তার গভীর নির্ভরতার প্রকাশ। বান্দার তাওহীদ যত দৃঢ় হয়, তার দু'আও তত বেশি, বিস্তৃত ও গভীর হয়। ফলে প্রভুর কাছে চাওয়া তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে এবং দু'আ তার নিয়মিত অভ্যাস ও স্থায়ী আমলে পরিণত হয়।

সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যার কাছে মহান আল্লাহ তার দু'আকে প্রিয় করে দেন, তাকে দু'আ কবুল হওয়ার কারণসমূহ জানিয়ে দেন, দু'আর আদব শিক্ষা দেন এবং তাকে দু'আর প্রতিবন্ধকতা ও কবুল হওয়ার বাধাসমূহ থেকে দূরে রাখেন।

আর যে ব্যক্তি তার রবকে সেভাবে ডাকে, যেভাবে তার রব পছন্দ করেন—এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন, তাকে নিজের নিকটবর্তী করেন, মর্যাদা দান করেন, আশ্রয় দেন এবং তাকে সম্মানিত করেন। যে ব্যক্তি দু'আর তাওফীক্ব লাভ করে, তার জন্য মূলত কবুল হওয়াই নির্ধারিত হয়। যখন বান্দাকে দু'আর চাবিকাঠি দেওয়া হয়, তখন মহান আল্লাহ তার জন্য কবুলের দরজা খুলে দিতে চান। উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি দু'আ কবুল হওয়া নিয়ে চিন্তা করি না, বরং আমি দু'আ করার চিন্তা করি। কারণ যখন আমাকে দু'আর তাওফীক্ব দেওয়া হয়, তখন তার সঙ্গে কবুল হওয়াও থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালোবাসেন যে, তাঁর বান্দা অধিক পরিমাণে দু'আ করবে। কেননা তার দু'আর ফল সুনিশ্চিত।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুসলিম দু'আ করার সময় কোনো গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ না করলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে এ তিনটির একটি দান করেন— (১) হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত সুপারিশ দুনিয়ায় দান করেন, অথবা (২) তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন, অথবা (৩) তার অনুরূপ কোনো অকল্যাণ বা বিপদাপদকে তার থেকে দূরবর্তী করে দেন। ছাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করব। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দেন।[৮২]

বান্দা যত বেশি তার রবের কাছে মিনতি করে, আল্লাহ তাকে তত বেশি ভালোবাসেন, তার নিকটবর্তী করেন এবং তাকে দান

৮১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪২।

৮২. আহমাদ, হা/১১১৪৯; মিশকাত, হা/২২৫৯।

করেন। কারণ বান্দা সেই রবের কাছেই প্রার্থনা করে, যিনি তাকে প্রতিপালন করেছেন, তাকে নেয়ামত দিয়েছেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

অতএব, বান্দার উচিত প্রবল আগ্রহ নিয়ে দু'আ করা এবং বেশি বেশি প্রার্থনা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন ফেরদাউস জান্নাত চাইবে। কারণ সেটি হচ্ছে সবচেয়ে প্রশস্ত ও সবচেয়ে উঁচু জান্নাত। আর দয়ালু (আল্লাহর) আরশটি এরই উপর অবস্থিত। এই ফিরদাউস থেকেই জান্নাতের ঝর্ণাগুলো প্রবাহিত'।[৮৩]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ ভালোবাসেন যে, বান্দা নিজের কাছে সম্মানিত থাকবে, কিন্তু তার রবের সামনে বিনয়ী হবে এবং মানুষের কাছে চাওয়া থেকে সংযমী থাকবে, কিন্তু তার প্রভুর কাছে অবশ্যই প্রার্থনা করবে। সে মানুষের কাছে অমুখাপেক্ষী থাকবে, কিন্তু তার রবের দরবারে নিজেকে অসহায় ও মুখাপেক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবে। বান্দার জন্য এটি খুবই নিন্দনীয় যে, সে মানুষের কাছে চাইতে যায়; অথচ তার প্রভুর কাছেই তার সব চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। কত এমন বান্দা আছে যাকে তার রব কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন, যাতে তাকে তাঁর প্রশস্ত দরবারের দিকে ফিরিয়ে আনেন, তার বিনম্র দু'আ শুনেন এবং তার অশ্রুসজল চোখ দেখতে পান।

হে ঈমানদারগণ! মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের শিখিয়েছেন তারা কীভাবে তাঁর কাছে দু'আ করবে। তিনি বলেন, 'আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। অতএব, তোমরা সেই নামগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকো এবং তাদের পরিত্যাগ করো, যারা তাঁর নামসমূহের ব্যাপারে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত, অচিরেই তার প্রতিফল পাবে' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৮০)*।

অতএব, বান্দা যখন দু'আর মধ্যে তার প্রভুর কাছে তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে বিনয়াবনত হয়ে প্রার্থনা করে, যথাস্থানে সেই নামগুলো ব্যবহার করে এবং নামের অর্থ জেনে সেই নাম অনুযায়ী দু'আ করে, তখন তা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হয় এবং দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি হয়।

বিশেষ করে যখন বান্দা তার রবের দিকে সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব নিয়ে ফিরে আসে, তাঁর প্রতি আন্তরিক হয়, তাঁর সাহায্য কামনা করে, তাঁর সামনে আদব বজায় রাখে, পবিত্র অবস্থায় থাকে, দুই হাত প্রসারিত করে ক্বেবলামুখী হয়; তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দু'আ কবুল করেন, তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তার জন্য তাঁর রহমতের দরজাগুলো খুলে দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'কে সেই সত্তা, যিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দু'আ কবুল করেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করে দেন?' *(আন-নামল, ২৭/৬২)*।

হে মুসলিমগণ! যে ব্যক্তি চায় তার দু'আ কবুল হোক, তার মধ্যে মূলত দুটি বিষয় থাকা জরুরী। এর মধ্যে প্রথমটি হলো আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং তাঁর আনুগত্যের উপর আত্মসমর্পণ করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী। আমি দু'আকারীর দু'আ কবুল করি, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ লাভ করে' *(আল-বাকারা, ২/১৮৬)*।

দ্বিতীয়টি হলো দু'আর সময় আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা করা। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের রবকে বিনয়সহ ও গোপনে ডাকো' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৫)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! দু'আর মধ্যে সর্বোত্তম হলো যে দু'আগুলোতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একত্রে কামনা করা হয়। যার শব্দগুলো থাকে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক হয়। আমাদের মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন দু'আ পছন্দ করতেন যা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থবহ হতো এবং তিনি অন্য সকল প্রকার দু'আ পরিহার করতেন।[৮৪]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময়ই এ দু'আ করতেন, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ায় এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করো। আর জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও' *(আল-বাক্বারা, ২/২০১)*।[৮৫]

দু'আর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা, আল্লাহর সামনে দীনতা ও ভগ্নতা প্রদর্শন করা এবং দু'আ গোপনে করা। এটি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত নির্দেশ পালনের জন্য যে, 'তোমরা তোমাদের রবকে বিনয়সহ ও গোপনে ডাকো। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৫)*। যেমনটা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন, 'যখন তিনি তাঁর রবকে নিঃশব্দে ডাকলেন' *(মারইয়াম, ১৯/৩)*।

দু'আ কবুলের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি আদব হলো তাড়াহুড়ো না করা। তাড়াহুড়োর অর্থ হলো দু'আর ফল দ্রুত পাওয়ার আশা করা এবং দু'আ কবুল হতে দেরি হওয়াকে অপছন্দ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল হয়ে থাকে, যদি সে তাড়াহুড়ো না করে এবং বলে যে, আমি দু'আ করলাম; কিন্তু আমার দু'আ তো কবুল হলো না'।[৮৬]

যে বান্দা তার রবের কাছে কল্যাণের আশায় দু'আ করে এবং সঠিক পথে চলতে চায়, তার জন্য উচিত নয় যে, সে এমন ইবাদতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কারণ যত বেশি সে দু'আ করবে, তত বেশি সে তার রবের নিকটবর্তী হবে এবং তার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। তাছাড়া সে তার দু'আর জন্য ছওয়াব লাভ করে এবং তার দু'আর পরিমাণ অনুযায়ী তার থেকে অমঙ্গল দূর করা হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এটি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বান্দা দু'আর জন্য প্রচেষ্টা করে; কিন্তু তার দু'আ কবুল হয় না। এর কারণ হলো সে দু'আর কিছু নিষিদ্ধ বিষয় বা কবুল হওয়ার প্রতিবন্ধকতায় নিমজ্জিত হয়। আর নবী ﷺ এমন দু'আ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, যা কবুল করা হয় না।

জেনে রাখুন! দু'আ কবুলের সবচেয়ে বড় ও বিপজ্জনক প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো হারাম উপার্জন বা

৮৩ . ছহীহ বুখারী, হা/৭৪২৩; মিশকাত, হা/৩৭৮৭।

৮৪ . ছহীহুল জামে', হা/৪৯৪৯।

৮৫ . ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯০।

৮৬ . ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৪০।

হারাম খাদ্য গ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যে দু'আ কবুলের সম্ভাব্য সব উপায় একত্র করেছিল— দীর্ঘ সফর, শারীরিক ক্লান্তি ও নাজেহাল অবস্থা, আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করা এবং রবের নামে বারবার মিনতি করা। কিন্তু তার খাদ্য ছিল হারাম, পোশাক ছিল হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দু'আ তিনি কীভাবে কবুল করতে পারেন?'[৮৭] অর্থাৎ তার এই অবস্থায় দু'আ কবুল হওয়া কতই না দূরের বিষয়!

দু'আ কবুল না হওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ হলো দু'আকারীর তার দু'আ ও প্রার্থনায় আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা এবং সীমালঙ্ঘন করা। আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।

দু'আয় সীমালঙ্ঘনের অনেক রূপ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো এমন দু'আ করা, যাতে শিরক রয়েছে। যেমন- কেউ নবী বা অলীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে; অথচ দু'আ একটি ইবাদত, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য করা বৈধ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও ডাকে, সে আল্লাহর সাথে শিরক করল। অথচ আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে পবিত্র ও মহান। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না' *(আল-জিন, ৭২/১৮)*।

দু'আয় সীমালঙ্ঘনের আরেকটি রূপ হলো গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ করা। যেমন- কেউ তার রবের কাছে কোনো অন্যায় কাজ সহজ করে দেওয়ার জন্য বা কোনো হারাম কাজ করার জন্য প্রার্থনা করে অথবা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর ধ্বংস, লাঞ্ছনা, অভিশাপ বা তার সম্পদ ধ্বংসের জন্য দু'আ করে। আর যদি সেই দু'আ নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে হয়, তবে তার গুনাহ আরও বেশি গুরুতর হয়।

দু'আয় সীমালঙ্ঘনের আরেকটি রূপ হলো অতিরিক্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে চাওয়া। একবার আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পুত্র (ইয়াযীদ)-কে বলতে শুনলেনে যে, ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাতের ডান পার্শ্বস্থ শ্বেত প্রাসাদ প্রার্থনা করি, যখন আমি সেখানে প্রবেশ করব। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি জান্নাত কমনা করো এবং দোযখ হতে মুক্তি প্রার্থনা করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, 'অদূর ভবিষ্যতে এই উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দু'আর মধ্যে অতিরঞ্জিত করবে'।[৮৮]

দু'আয় সীমালঙ্ঘনের আরেকটি রূপ হলো অতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা বা চিৎকার করা। এই কাজের নিন্দনীয় দিক প্রমাণের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা এই কাজ সম্পাদনকারীর প্রতি সন্তুষ্ট নন আর এমন দু'আ থেকে কীভাবে কল্যাণ আশা করা যায়! মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের রবকে বিনয়সহ ও গোপনে ডাকো; নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৫)*।

৮৭ . ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫।

৮৮ . আবূ দাঊদ, হা/৯৬।

আরও একটি সীমালঙ্ঘন হলো দু'আর জন্য নির্দিষ্ট কিছু স্থানকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করা। যেমন- কবরস্থান, নবী বা নেককার ব্যক্তিদের নিদর্শনের কাছে গিয়ে দু'আ করা এবং মনে করা যে, সেখানে দু'আ করা অন্য স্থানের চেয়ে বেশি উত্তম; অথচ এর স্বপক্ষে কুরআন বা সুন্নাহতে কোনো প্রমাণ নেই।

بارَكَ اللهُ لِي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيه من الآيات والذِّكْر الحكيم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। তিনি মানুষের জন্য (রহমতের) একটি দরজা উন্মুক্ত করেছেন, তাদেরকে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দু'আ কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং তিনি নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ। আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সৎ ও পরহেযগার ছাহাবীদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! সৌভাগ্যবান সেই বান্দা, যে তার প্রতিপালকের কাছে দু'আ করার জন্য সম্মানিত সময় ও উত্তম অবস্থাগুলো বেছে নেয় এবং সর্বোত্তম দু'আগুলো তালাশ করে। সে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য রাতের শেষ অংশকে নির্ধারণ করে, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। সে আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে তার প্রভুর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, জুমআর দিনের শেষ মুহূর্তে এবং নিজের ছালাতের সিজদার মধ্যেও দু'আ করে।

আর সম্মানিত ও ফযীলতপূর্ণ সময়গুলোর মধ্যে রয়েছে রামাযানের শেষ দশ দিন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন এবং ইবাদতসমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর, যেমন- হজ্জ সম্পন্ন করার পরে। এছাড়াও ছালাতের শেষ অংশে, বিশেষ করে সালাম ফিরানোর আগে দু'আ করা। যেমনটি আমাদের নবী ﷺ অধিকাংশ সময় করতেন।

আর বান্দার জন্য সেসব অবস্থায় দু'আ করা উত্তম, যখন বান্দা তার অন্তরের মধ্যে স্বচ্ছতা অনুভব করে, নিয়্যতের মধ্যে আন্তরিকতা থাকে, আল্লাহর দিকে তার একনিষ্ঠ মনোযোগ থাকে এবং তার আগ্রহ সত্য ও আন্তরিক হয়। এমন অবস্থায় সে সর্বোত্তম ও ব্যাপক অর্থবহ দু'আগুলোকে তালাশ করে।

হে ঈমানদারগণ! সর্বোত্তম ও সর্বাধিক পরিপূর্ণ দু'আ হলো পবিত্র কুরআনে বর্ণিত দু'আগুলো। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই এগুলো উচ্চারণ করেছেন, তাঁর বান্দাদেরকে এগুলো দিয়ে প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর মনোনীত শ্রেষ্ঠ রাসূলগণের বিনীত প্রার্থনার বর্ণনা হিসেবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এই দু'আগুলোর মধ্যে কিছু দু'আ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন।

হে মুসলিমগণ! আপনারা আজকের এই দিনে বেশি বেশি দরূদ ও সালাম পাঠ করুন সেই রহমতস্বরূপ প্রেরিত মহান নেয়ামত আমাদের নবী, আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ -এর উপর।

www.al-itisam.com

কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৫)

মুমিন, মুত্তাক্বী ও কাফেরদের বর্ণনা দেওয়ার পর মহান আল্লাহ মুনাফিক্বদের বর্ণনা দিচ্ছেন। মরুভূমিতে ইঁদুরের মতো এক প্রজাতির প্রাণী বসবাস করে, যাদের দুই মুখওয়ালা মাটির গর্ত থাকে। দ্বিমুখী সুড়ঙ্গের কোনো একটি শত্রু সন্ধান পেয়ে গেলে সে অন্য মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। এই দ্বিমুখিতা থেকেই মুনাফিক্ব শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। মুনাফিক্বী মূলত দুই প্রকার— প্রথমত, আমলগত নিফাক্বী, যেমন- মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, গালি দেওয়া ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়ত, প্রকৃত ও অন্তরের নিফাক্বী। মুহাম্মাদ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন এবং বদরের যুদ্ধে বিজয় অর্জন করলেন, তখন অনেকেই দুনিয়াবী সামাজিক কারণে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে শুরু করে, অথচ তাদের অন্তরে কুফরী ছিল। তাদের উদ্দেশ্যেই মূলত এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে।

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾

আর মানুষদের মধ্যে মুনাফিক্বরা দাবি করে যে, তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। অথচ তারা একনিষ্ঠভাবে অন্তর থেকে ঈমান আনয়ন করেনি।

শেষ দিন অর্থ হলো- যেদিন সময় আর চলমান থাকবে না, স্থির হয়ে যাবে এবং মানুষ যেদিন অনন্তকালের জগতে প্রবেশ করবে সেটিই শেষ দিন।

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

যারা দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে একনিষ্ঠতার সাথে অন্তর থেকে ঈমান আনয়ন করে না, তারা নিজেদেরকে অনেক বুদ্ধিমান মনে করে। তারা মনে করে, তারা এভাবে মহান আল্লাহ ও মুমিনদেরকে বোকা বানাচ্ছে। অথচ নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে, মূলত তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, কিন্তু তারা সেটা বুঝতে পারে না। কেননা তাদের এই ধোঁকা দুনিয়াতে ও শেষ বিচারের দিনে ধরা পড়বে। দুনিয়াতে যখন দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হবে, তখন তারা কষ্ট করার ভয়ে নিজের মুনাফিক্বী প্রকাশ করে দিবে যেমন উহুদের যুদ্ধে জীবন বাঁচাতে মুনাফিক্বরা করেছিল। আর পরকালে তো মহান আল্লাহ অন্তর দেখবেন। সুতরাং মুনাফিক্বরা দুনিয়াতে ও পরকালে উভয় জগতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾

তাদের অন্তরে মুনাফিক্বীর রোগ রয়েছে আর মহান আল্লাহ এই রোগকে আরো বাড়িয়ে দেন। তথা মহান আল্লাহ মুনাফিক্বদের ছাড় দেন। আর তারাও মনে করে যে, যেহেতু তাদের চালাকি ও কৌশল সফল হচ্ছে, তাই তারা আরো অধিক মুনাফিক্বীর পথে এগিয়ে যায়। এভাবে তারা পূর্ণ মুনাফিক্বে পরিণত হয়। আর তাদের এই মিথ্যা ও ধোঁকার কারণে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ - أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

পৃথিবীতে যুগে যুগে এই ধরনের দ্বিচারিতায় পরিপূর্ণ অসংখ্য মানুষ রয়েছে। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এভাবে দ্বিমুখী আচরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা উত্তরে বলে, আমরা বরং শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। আজকের যুগেও সন্ত্রাসী দেশগুলো নিজেদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে প্রচার করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামেই তারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। একই অবস্থা ছিল মদীনার মুনাফিক্বদের। অথচ প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, সৃষ্টিকে তার সৃষ্টিকর্তার নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনা করা। সৃষ্টিকর্তার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো সৃষ্টিজীবের ক্ষতি আর এটিই ফেতনা-ফাসাদ। অতএব, যারা মহান আল্লাহর

৮৯* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

বিধানের প্রতি অন্তর থেকে ঈমান আনয়ন করে না, তারা ফাসাদ সৃষ্টিকারী; যদিও তারা বুঝতে পারে না।

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

তাদের এই মুনাফিক্বী বুঝতে পেরে মদীনার মুমিনগণ তাদেরকে একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের দাওয়াত দেয়। তারা তাদেরকে ছাহাবীদের মতো নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনার জন্য বললে তারা উত্তরে বলে, আমরা তাদের মতো বোকা নই। তাদের কাছে মুমিন ছাহাবীদের সামাজিক স্ট্যাটাস ছিল অনেক নিচু ও হীন। তারা নিজেদের স্ট্যাটাসকে অনেক বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ ও সামাজিকভাবে উঁচু মনে করত। তাই তারা উত্তরে ছাহাবীদেরকে নির্বোধ বলে সম্বোধন করে। আজকের যুগেও যারা ইসলাম পূর্ণভাবে মানতে চায়, তাদেরকে সমাজের নিচু বা বোকা মনে করা হয়। চাকরির জন্য যারা দাড়ি কাটতে আগ্রহী নয়, তাদেরকে এলিট শ্রেণি ‘ক্ষ্যাত’ (অনগ্রসর) মনে করে। তবে মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে যারা দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য দ্বীন বিসর্জন দেয়, তারাই বোকা। কেননা দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর পরকাল চিরস্থায়ী। তাই তো মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর জেনে রাখো, প্রকৃত অর্থে এই মুনাফিক্বরাই নির্বোধ; যদিও তারা তা জানে না’।

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾

মুনাফিক্বদের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা যখন মুমিনদের সাথে উঠাবসা করে, তখন নিজেদেরকে মুমিন বলে পরিচয় দেয় আর যখন তাদের শয়তানদের কাছে যায়, তখন তাদেরকে বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি; বরং আমরা মুমিনদের সাথে মজা নিচ্ছি এবং ঠাট্টা করছি মাত্র। শয়তান দ্বারা এখানে মানুষ শয়তানই উদ্দেশ্য। তারা যেমন একদিকে মুমিন সাজার বাহানা করে দুনিয়াবী সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখত, আবার ইয়াহূদী ও মুশরিক শয়তানদের কাছে গিয়ে মুসলিমদের গোপন কথা বলে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করত। আর তারা মুসলিমদের সহজতা ও সরলতা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত। তারা তাদের এই ধোঁকাবাজি ও চালাকিকে অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করত।

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

তাদের গর্ব, অহংকার ও হাসি-ঠাট্টার জবাবে মহান আল্লাহ বলেন, মহান আল্লাহ নিজেও তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন। আর মহাপরাক্রমশালী সত্তা যদি কারো সাথে উপহাস করেন, তাহলে তার অবস্থা কী হতে পারে? তারা যেমন এটা ভেবে গর্ব করছে যে, মুমিনরা তাদের চালাকি ধরতে পারে না। মহান আল্লাহ তেমনি তাদেরকে একটি ভ্রমের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। যেমনটা বড়শির খাবার মুখে নিয়ে যখন মাছ দৌড়ে যায়, তখন সেও একটা ভ্রমের মধ্যে থাকে। কেননা তখন বড়শি নিক্ষেপকারী ব্যক্তি তার সুতা ঢিল দিয়ে রাখেন। ঠিক আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা ও অহংকারের ভ্রমে তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন। বড়শির লাঠি অথবা ঘুড়ির নাটাইয়ের মতো মানুষের জীবন-মৃত্যু থেকে সকল কিছুর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ মহান আল্লাহর হাতে আর এটিই তাঁর ঠাট্টা। কেননা যখন তিনি পাকড়াও করবেন, তখন কারো কোনো কৌশল কাজে আসবে না। অতএব, প্রকৃত বোকা তারাই এবং প্রকৃত হাসির পাত্র তারাই; মুমিনেরা নয়। মুমিনদের সাথে রয়েছেন মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহ নিজেই।

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

এ সকল মুনাফিক্বরা এভাবে ধোঁকাবাজির মাধ্যমে মূলত দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করেছে। হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। তাদের এই ক্রয়-বিক্রয় লাভজনক নয়। তারা চাইলে প্রকৃত অর্থে হেদায়াত গ্রহণ করতে পারত, কেননা তাদের অন্তর কাফেরদের মতো মোহর মারা মৃত নয়; বরং তাদের অন্তর অসুস্থ। যেখানে হেদায়াতের নূর প্রবেশ করেছিল, কিন্তু তারা সেই নূর আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারেনি।

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ - صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾

মুনাফিক্বদের এই অবস্থাকে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য মহান আল্লাহ দুটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছেন। প্রথমত, তাদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে এক টুকরো আলোর ব্যবস্থা করল। অতঃপর যখন চারিদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ল, তখনই মহান আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন আর তারা পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্ত সেই মুনাফিক্বদের জন্য, যারা সত্যের নূর দেখার পরও সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে সেই নূরকে গ্রহণ করতে পারেনি। তথা আলো পাওয়ার পরেও তারা অন্ধকারে

ডুবে গেছে, তাদের কান থাকার পরেও যেন তারা বধির, মুখ থাকার পরেও বোবা, চোখ থাকার পরও অন্ধ। তাই তাদের পক্ষে আর অন্ধকার থেকে প্রত্যবর্তন করা সম্ভব নয়।

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ - يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

দ্বিতীয়ত, তাদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে এক বৃষ্টিস্নাত দিনে পথ চলছে, যেখানে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, সাথে মেঘের গর্জন ও বিজলির চমকও রয়েছে। মেঘের গর্জনে মৃত্যুর ভয়ে তারা তাদের কানে আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে। বিজলির চমক যেন তাদের দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নিচ্ছে। এই রকম ভয়ঙ্কর পরিবেশে যখনই বিজলি থেকে একটু আলো প্রকাশ পাচ্ছে, তখনই তারা সেই আলোতে চলার চেষ্টা করছে। আর যখন আলো বিদায় নিচ্ছে, তখন তারা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকছে। যদি মহান আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি একেবারে ছিনিয়ে নিতেন। আর মহান আল্লাহ কাফেরদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

এই দৃষ্টান্ত তাদের জন্য, যারা ঈমানের নূর পেয়েছে ঠিকই; কিন্তু দুনিয়াবী বিপদ-আপদে সেই নূরের উপর টিকে থাকার ইস্তিক্বামাত, ছবর ও হিম্মত তাদের নেই। সামান্য বিপদেই তারা দ্বীন বিসর্জন দিয়ে দেয়। তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে দুনিয়াবী বিপদ-আপদের ভয়ে অহীর নূর থেকে পূর্ণ উপকার গ্রহণ করতে পারছে না।

অতএব, মুনাফিক্বী থেকে বাঁচতে কোনো দুনিয়াবী স্বার্থের লোভে অথবা কোনো দুনিয়াবী বিপদ-আপদ ও মৃত্যুর ভয়ে ঈমানের নূর পরিত্যাগ করা যাবে না। বরং তাকে পরিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করতে হবে। ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য সকল দুনিয়াবী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরকালের বিজয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু স্বার্থ বিসর্জন নয়, বরং সকল দুনিয়াবী বিপদ-আপদ এমনকি মৃত্যু ভয়কে জয় করতে হবে।

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

সূরা আল-বাক্বারার শুরু থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ আমরা দেখেছি— মুত্তাক্বী, কাফের ও মুনাফিক্ব। কুরআনের নূরের আলো যে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে, সেই মুত্তাক্বী; যার অন্তর মৃত ও মোহর মারা, সে কাফের এবং যে নূর পেয়েও দুনিয়াবী কারণে পরিপূর্ণ গ্রহণ করতে পারেনি, সে মুনাফিক্ব। এই আলোচনার পর মহান আল্লাহ কুরআনের মূল দাওয়াতকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তুলছেন। কুরআনের সারমর্ম দাওয়াত হচ্ছে, ইলাহ হওয়ার একমাত্র যোগ্য সেই, যে রব। তথা ইবাদতের একমাত্র যোগ্য সেই, যে সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে এবং পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা যার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে। মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্বোধন করে তাদেরকে বলছেন, হে দুনিয়ার সকল মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি শুধু তোমাকে সৃষ্টি করেননি; বরং তোমাকে, তোমার পূর্বের এবং তোমার পরের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি পৃথিবী গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান হওয়ার পরেও সেখানে তোমাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। ঠিক যেভাবে তোমরা তোমাদের বিছানায় আরামে ঘুমাও, এই পৃথিবীও তেমনি বসবাসের জন্য মহাশূন্যের মধ্যে সবচেয়ে আরামদায়ক গ্রহ। তোমাদের বাড়ির ছাদ যেমন তোমাদেরকে বাইরের সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে, পৃথিবীর আকাশও এমনভাবে সাজানো যে সূর্যের সকল ক্ষতিকর রশ্মি, উল্কাপিণ্ড ইত্যাদি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করে।

শুধু তাই নয়, এই পৃথিবীতে জীবন ধারণের সবচেয়ে বড় অনুষঙ্গ হচ্ছে পানি, যা অন্য গ্রহে নেই। সেই পানি তিনি আকাশ থেকে বর্ষণ করেন এবং সেই পানি দিয়েই তিনি মাটি থেকে ফল-ফলাদি ও শস্য উৎপাদন করে থাকেন। তথা মানুষের জীবন ধারণের সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় মাটি ও পানি আর এই দুটির একচ্ছত্র মালিক হলেন মহান আল্লাহ। অতএব, যেহেতু তোমরা জান সৃষ্টির ক্ষমতা আল্লাহর, পানি দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর, মাটি থেকে ফসল ফলানোর ক্ষমতা আল্লাহর; সেহেতু তোমরা ইবাদত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যুক্ত করো না।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একজন মুসলিমের আচরণ

মূল: সুলতান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উমরী
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী*

১. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসা, এই ভালোবাসা প্রকাশ পাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ‘তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো’ *(আল-মায়েদা, ৫/৯২)*। আর হাদীছে এসেছে, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে উঠি’।[৯১]

২. প্রতি মুহূর্তে, বিশেষত শুক্রবারের রাত ও দিনে তাঁর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করা।

৩. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারিত হলে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার প্রতি আরও জোরালোভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে, الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ‘সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়; অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না’।[৯২]

৪. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও সুন্নাহকে সকল মানুষের মতামতের উপর প্রাধান্য দেওয়া।

৫. যেসব হাদীছ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নামে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা। হাদীছে এসেছে, مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‘যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কিছু বর্ণনা করে যা আমি বলিনি, তার জন্য জাহান্নামে একটি আসন নির্ধারিত থাকবে’।[৯৩]

৬. সাধ্যানুযায়ী তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যতটুকু সম্ভব’ *(আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)*। এই ভয় প্রকাশ পাবে ইবাদত, চরিত্র ও অন্যান্য বিষয়ে ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী চলার মাধ্যমে।

৭. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ মানুষদের মাঝে হিকমত বা জ্ঞান ও বিবেচনার সাথে এবং উত্তম পন্থায় ছড়িয়ে দেওয়া। হাদীছে এসেছে, بَلِّغُوا عَنِّي وَ لَوْ آيَةً ‘আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও’।[৯৪]

৮. যখন কেউ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ নিয়ে কটাক্ষ করে বা আক্রমণ করে, তখন মুসলিমের কর্তব্য হলো তাঁর সুন্নাহর পক্ষে দৃঢ়ভাবে ঢাল হয়ে দাঁড়ানো। আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছু লোক যদি তাদের বংশ বা গোত্র নিয়ে কেউ কিছু বলে, তবে তারা ভীষণ রেগে যায়; কিন্তু কেউ যদি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কিছু বলে, তাহলে তারা চুপ থাকে, কিছুই বলে না। নিঃসন্দেহে এটি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসায় দুর্বলতার স্পষ্ট চিহ্ন।

৯. তিনি যে সকল গায়েবী সংবাদ (অদৃশ্য জগতের খবর) এনেছেন, যেমন- ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ, কবরের আযাব, ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থা এগুলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

১০. তিনি যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকা। কারণ এটাই জান্নাতে যাওয়ার পথ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ‘আমার উম্মতের সকল মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু সে ব্যক্তি ছাড়া যে নিজে তা অস্বীকার করে’। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, ‘যে আমার আনুগত্য করে, সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার অবাধ্য হয়, সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার করেছে’।[৯৫]

১১. তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন না করা এবং তাঁকে আল্লাহর গুণাবলি বা উপাসনার অধিকার প্রদান না করা, তাঁকে ডাকা, তাঁর নামে কসম খাওয়া বা এমন কোনো ইবাদত করা যা কেবল আল্লাহরই হক্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ‘বলুন, আমি তো কেবল তোমাদেরই মতো একজন মানুষ’ *(আল-কাহফ, ১৮/১১০)*।

বাকি অংশ ৩৮ নং পেজে...

৯০* অধ্যয়নরত, কুল্লিয়্যাহ ২য় বর্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
৯১. ছহীহ বুখারী, হা/১৫।
৯২. ছহীহুল জামে‘, হা/২৮৭৮।
৯৩. ছহীহ বুখারী, হা/১০৯।
৯৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১।
৯৫. ছহীহ বুখারী, হা/৭২৮০।

ফাযায়েলে আমল

যুলহিজ্জাহ মাসের ইবাদত

-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)*

১. যুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদাতের শ্রেষ্ঠত্ব

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ ‘শপথ, দশ রাতের!’ *(আল-ফজর, ৮৯/২)*। উক্ত দশ রাত দ্বারা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা, ক্বাতাদা, মুজাহিদ রাহিমাহুমাল্লা-হু-সহ অনেক মুফাসসিরের মতে, যুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন-রাত বুঝানো হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْعَشْرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল করা আল্লাহর নিকট যত বেশি প্রিয় আর কোনো দিনের আমল তাঁর কাছে তত প্রিয় নয়’। ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়; তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে গেছে, কিন্তু তার কিছুই ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারেনি’।[৯৭]

শিক্ষা: অতএব, কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা জানা গেল যে, যুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন-রাতের আমলসমূহ অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিক উত্তম ও ফযীলতপূর্ণ। এই দিনগুলো হলো ছওয়াব অর্জনের মৌসুম। কাজেই নফল আমলগুলো করার ব্যাপারে সকলকে আগ্রহী হতে হবে এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ ‘অতএব, সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা করো’ *(আল-মায়েদা, ৫/৪৮)*।

২. সুন্নাতী তরীকায় হজ্জ সম্পন্ন করা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়’।[৯৮]

শিক্ষা: হজ্জে যাওয়ার আগে সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এই বিষয়ে জানা তার উপর ফরয। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে হজ্জ সম্পাদন করেছেন, তা সুন্দর ও বিশুদ্ধভাবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যা বাংলায় অনুবাদসহ পাওয়া যায়। অথবা নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞ আলেম এর নিকট থেকে হজ্জের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জেনে নিতে হবে, অন্যথা হজ্জে ভুল হলে তা গ্রহণযোগ্য হজ্জ বলে বিবেচিত হবে না।

৩. প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম, আরাফার দিনের ও আশূরার ছিয়ামের ফযীলত:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘প্রতি মাসের তিনটি ছিয়াম, এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান পর্যন্ত, এটা সারা বছর ছিয়াম রাখার মতো। আর আরাফার দিনের ছিয়ামের ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি পূর্বের ও পরের বছরের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর আশূরার দিনের ছিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আমি আশা রাখি যে, তিনি এর দ্বারা পূর্বের বছরের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন’।[৯৯]

শিক্ষা: আরাফা ও মুহাররমের ছিয়াম বছরে বেশি ছওয়াব অর্জনের দুটি বোনাস। কাজেই জ্ঞানীরা কখনো বোনাস ছেড়ে দেয় না।

৯৬* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৯৭. আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৮; তিরমিযী, হা/৭৫৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৭; মিশকাত, হা/১৪৬০, হাদীছ ছহীহ।

৯৮. তিরমিযী, হা/৮১০; নাসাঈ, হা/৩৬৩০; ইবনু মাজাহ, হা/২৮৮৭; মিশকাত, হা/২৫২৪, হাদীছ ছহীহ।

৯৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪।

www.al-itisam.com

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

সুন্নাতে রাতেবা ও ফজরের সুন্নাত

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

মানুষ দিনে ও রাতে নিয়মিত যে সুন্নাতে রাতেবা আদায় করে, তার মধ্যে ফজরের সুন্নাতই প্রথম এবং এর মাঝেও বেশ কিছু সুন্নাত নিহিত রয়েছে। সেগুলো আলোচনা করার পূর্বে সুন্নাতে রাতেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরী।

সুন্নাতে রাতেবা:

ফরয ছালাতের সাথে সংযুক্ত স্থায়ী সুন্নাত অর্থাৎ ফরয ছালাতের আগে বা পরে যে ছালাত নিয়মিত পড়ার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, সেগুলোই সুন্নাতে রাতেবা। আর তা হলো ১২ রাকআত। উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে ১২ রাকআত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে’।[১০০]

হাদীছটি তিরমিযীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত ও পরে ২ রাকআত, মাগরিবের পরে ২ রাকআত, এশার পরে ২ রাকআত এবং ফজরের পূর্বে ২ রাকআত।[১০১]

সুন্নাতে রাতেবা বাড়িতে আদায় করা উত্তম: যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই ছালাত আদায় করো। কেননা ফরয ছালাত ছাড়া লোকেরা ঘরে যে ছালাত আদায় করে, তা-ই উত্তম’।[১০২]

সুন্নাতে রাতেবার মধ্যে যে সুন্নাত বেশি গুরুত্বপূর্ণ:

সুন্নাতে রাতেবার মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে ফজরের সুন্নাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নফল ছালাতকে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন না।[১০৩] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) ছালাত দুনিয়া ও তার মধ্যে সবকিছুর চেয়ে উত্তম’।[১০৪]

১০০. ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৮।
১০১. তিরমিযী, হা/৪১৫, তিনি হাদীছটিকে হাসান ছহীহ বলেছেন।
১০২. ছহীহ বুখারী, হা/৭২৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮১।
১০৩. ছহীহ বুখারী, হা/১১৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৪।
১০৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৫।

ফজরের সুন্নাতের নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

১. ফজরের সুন্নাত সফর ও মুক্বীম উভয় অবস্থায় আদায় করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। অপরদিকে যোহর, মাগরিব এবং এশার সুন্নাতে রাতেবাগুলো সফর অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া সুন্নাত।

২. ছওয়াবের দিক থেকে ফজরের সুন্নাত দুনিয়া ও তার সব কিছু থেকে উত্তম।

৩. ফজরের সুন্নাত হালকা করে আদায় করা সুন্নাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) ছালাত এত হালকাভাবে আদায় করতেন যে, আমি বলতাম, তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ছালাতের দুই রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়েছেন?[১০৫]

তবে শর্ত হচ্ছে, হালকার কারণে যেন ছালাতের রুকন ও ওয়াজিব ছুটে না যায় অথবা মুরগির ঠোকর মারার মতো না হয়ে যায়। যদি এরূপ হয়, তাহলে নিষিদ্ধের মধ্যে পড়ে যাবে।

৪. ফজরের সুন্নাতে সূরা ফাতেহার পর প্রথম রাকআতে সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাছ পড়া সুন্নাত অথবা সূরা ফাতেহার পর প্রথম রাকআতে قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ *(আল-বাক্বারা, ২/১৩৬)*। আর দ্বিতীয় রাকআতে قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ পাঠ করা সুন্নাত *(আলে ইমরান, ৩/৬)*। এই সুন্নাতগুলো বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৫. ফজরের সুন্নাত আদায় করার পর বাড়িতে ডান কাতে সামান্য শুয়ে যাওয়া সুন্নাত; বিশেষ করে যারা রাতে তাহাজ্জুদ পড়েছে, তাদের জন্য। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করার পর ডান কাতে শয়ন করতেন।[১০৬]

১০৫. ছহীহ বুখারী, হা/১১৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৪।
১০৬. ছহীহ বুখারী, হা/১১৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৬।

হেলথ কর্নার

কাঁচা আমের উপকারিতা ও সতর্কতা

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

গ্রীষ্ম এলেই গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় কাঁচা আম। কাঁচা আমের নাম শুনলেই অনেকের জিভে পানি চলে আসে। এটি শুধু স্বাদের জন্যই জনপ্রিয় নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর একটি ফল। বৈশাখ মাস থেকে বাজারে কাঁচা আমের সমারোহ শুরু হয়। গরমের দিনে কাঁচা আম দিয়ে তৈরি শরবত, আমপোড়া, আম পান্না কিংবা খাবারের শেষে টক-মিষ্টি চাটনি বাঙালির রসনায় এনে দেয় বিশেষ স্বাদ। আম দিয়ে ডাল, ভর্তা, আচারসহ নানা পদও তৈরি করা হয়।

কাঁচা আম বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এতে রয়েছে ভিটামিন, মিনারেল, খাদ্যআঁশ (ডায়েটারি ফাইবার) ও ক্যারোটিনয়েড। বিশেষ করে কাঁচা আম দিয়ে তৈরি আম পান্না গরমে হিটস্ট্রোক প্রতিরোধে সহায়ক বলে মনে করা হয়। ভিটামিন সি–এর ভালো উৎস হওয়ায় এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। আবার ক্যালোরি তুলনামূলক কম থাকায় কাঁচা আম বিপাকক্রিয়া সক্রিয় রাখতে ভূমিকা রাখে।

পুষ্টিবিদদের মতে, কাঁচা আম বা আমের শরবতে থাকা পটাশিয়াম গরমের দিনে শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। প্রায় ১০০ গ্রাম কাঁচা আমে থাকে প্রায় ৪৪ ক্যালরি শক্তি, প্রায় ৫৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি এবং প্রায় ২৭ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম।

কাঁচা আমের পুষ্টিগুণ:

কাঁচা আমে ভিটামিন সি, কে, এ, বি–৬, ফোলেটসহ নানা ধরনের পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এছাড়া এতে ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়ামও পাওয়া যায়। অন্যান্য অনেক ফলের তুলনায় কাঁচা আমে চিনি কম থাকে। তাই ডায়েট করা ব্যক্তিরা কিংবা ডায়াবেটিস রোগীরাও পরিমিত পরিমাণে এটি খেতে পারেন।

কাঁচা আমের উপকারিতা:

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: কাঁচা আমে প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে, যা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে। এটি শ্বেত রক্তকণিকার কার্যকারিতা বাড়ায় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এতে থাকা বিটা ক্যারোটিন হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও সহায়ক।

ওযন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক: যারা ওযন কমাতে চান, তাদের জন্য কাঁচা আম উপকারী হতে পারে। পাকা আমের তুলনায় এতে চিনি কম থাকায় অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণের আশঙ্কাও কম।

অম্লতা কমায়: বুক জ্বালাপোড়া বা অম্লতার সমস্যায় কাঁচা আম কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। অল্প পরিমাণ কাঁচা আম খেলে অনেক সময় অম্লতার উপসর্গ কমে।

বমি ভাব দূর করতে সাহায্য করে: বিশেষ করে সকালে বমি বমি ভাব হলে কাঁচা আম উপকারী হতে পারে। অনেক অন্তঃসত্ত্বা নারীও এই কারণে অল্প কাঁচা আম খেয়ে থাকেন।

ঝিমুনি দূর করে: গরমের দিনে দুপুরের খাবারের পর অনেকের ঝিমুনি আসে। কাঁচা আমে থাকা পুষ্টি উপাদান শরীরে কিছুটা সতেজতা এনে দিতে পারে।

যকৃতের স্বাস্থ্যে সহায়ক: কাঁচা আম চিবিয়ে খেলে পিত্তরস নিঃসরণ বাড়তে পারে, যা যকৃতের কার্যকারিতা ভালো রাখতে সহায়ক বলে মনে করা হয়।

ঘামাচি ও সানস্ট্রোক প্রতিরোধে সহায়ক: গরমের দিনে কাঁচা

১০৭* চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

আম খেলে শরীর কিছুটা ঠাণ্ডা থাকে। এজন্য অনেকেই মনে করেন এটি সানস্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

রক্তস্বল্পতায় সহায়ক: কাঁচা আমে কিছু পরিমাণ লৌহ বা আয়রন থাকে, যা রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে।

হজমে সহায়তা করে: কাঁচা আড৪চকমে থাকা খাদ্যআঁশ হজম প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।

শরীরে লবণের ঘাটতি পূরণে সহায়ক: গরমে অতিরিক্ত ঘামের ফলে শরীর থেকে কিছু লবণ বের হয়ে যায়। কাঁচা আমের শরবত এই ঘাটতি কিছুটা পূরণ করতে পারে।

হার্টের স্বাস্থ্যে উপকারী: কাঁচা আমে ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম রয়েছে, যা রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এতে থাকা ম্যাঙ্গিফেরিন নামক শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হৃদস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

স্কার্ভি প্রতিরোধে সহায়ক: ভিটামিন সি–সমৃদ্ধ হওয়ায় কাঁচা আম স্কার্ভি প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে এবং মাড়ি থেকে রক্ত পড়া কমাতে ভূমিকা রাখে।

চুল ও ত্বকের যত্নে সহায়ক: অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ হওয়ায় কাঁচা আম চুল ও ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে।

কীভাবে খাবেন:

গরমের দিনে কাঁচা আমের শরবত, আমপোড়া, চাটনি, ডাল, ভর্তা ইত্যাদি তৈরি করে খাওয়া যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য কাঁচা আম দিয়ে আচারও বানানো হয়।

সতর্কতা:

কাঁচা আম যতই উপকারী হোক, অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়। অনেকেই কাঁচা আমের টক স্বাদ কমাতে এতে অতিরিক্ত চিনি, লবণ বা ঝাল মেশান। এতে শরীরে অতিরিক্ত লবণ ও চিনি প্রবেশ করতে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। এছাড়া আমে ইউরুশিয়াল নামের একটি রাসায়নিক উপাদান থাকে, যা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে অ্যালার্জি বা পেট ফাঁপার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

তাই কাঁচা আম পরিমিত পরিমাণে খাওয়াই সবচেয়ে ভালো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একজন মুসলিমের বাকি অংশ

১২. যখন কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, তখন রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ বলেন, ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ‘যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর দিকে ফিরিয়ে দাও’ *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া। কিন্তু আপনি যখন বাস্তবে কিছু মানুষের অবস্থার দিকে তাকাবেন, তখন আশ্চর্য হবেন। কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়, মতবিরোধ হলে সে আচার-সংস্কারের দিকে ফিরে যায়, কেউ নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আবার কেউ মানুষের মনগড়া মতামত ও রুচির দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে একমাত্র সঠিক পথ হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া।

১৩. রাসূল ﷺ-এর আদেশ ও নিষেধের প্রতি পূর্ণ সাড়া দেওয়া এবং এতে কোনো দ্বিধা না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ডাকা হলে আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের এমন বিষয়ে আহ্বান করেন, যা তোমাদের জীবন দান করে’ *(আল-আনফাল, ৮/২৪)*।

১৪. এই বিশ্বাস রাখা যে, রাসূল ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না।

১৫. তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করা এবং সেখান থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা।

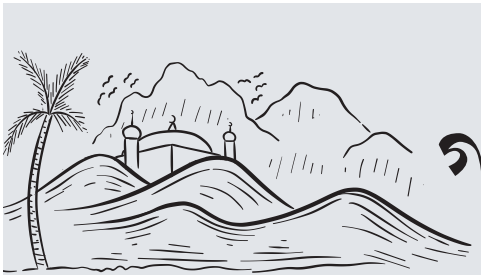
১৬. তাঁর ছাহাবীদের ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি মিত্রতা রাখা।

১৭. যারা তাঁর সুন্নাহর উপর অটল থাকে, তাদেরকে ভালোবাসা ও তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা।

১৮. যারা বিদআত প্রচার করে এবং রাসূল ﷺ-এর পথের বিপরীত পথে চলে, তাদের প্রতি ঘৃণা রাখা।

১৯. এই বিশ্বাস রাখা যে, রাসূল ﷺ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দ্বীনের বার্তা পূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম’ *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*।

২০. রাসূল ﷺ-এর আহলে বায়তকে (পরিবার ও বংশধরদের) ভালোবাসা ও তাদের সহযোগিতা করা। তবে কোনোভাবেই তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে অতিরঞ্জিত করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলী, ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বা অন্যান্য আহলে বায়তের কাউকে এমন মর্যাদায় উন্নীত করা যাবে না, যা তাদের প্রাপ্য নয়।



গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান



কুরবানীর হাট

-আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান*

ইদুল আযহা বছর ঘুরে খুশির ফোয়ারা নিয়ে উপস্থিত হয় প্রতিটি দুয়ারে। ইদুল আযহাকে কেন্দ্র করে আনন্দের সীমা থাকে না। স্বচ্ছ আকাশের মাঝে উল্লাসের ধ্বনি জটলা বেঁধে অনর্থক আলাপ করতে থাকে। মিষ্টি কণ্ঠে জানান দেয় বিহঙ্গের দল। পবনের স্নিগ্ধ সুর মাতাল মনে নেচে নেচে পরিবেশকে আরো মনোহর করে তোলে।

অর্ণব যেন তার বুকে সমস্ত স্ফূর্তি স্থান দিয়ে দাওয়াতের চিঠি পৌঁছে দেয় দূর প্রান্তে, কালের বিবর্তনে চাপা পড়ে থাকা স্বজনদের মাঝে। এই আনন্দে ল্যাম্পপোস্টের নিভু নিভু বাতিরাও পাটি দাঁতের সারি মিলিয়ে হাসতে থাকে। এতে অভিমানীদের গোমড়া মুখে জমে থাকা অভিমানগুলো সেকালেই ভেঙে যায়।

শুরু হয়ে যায় কনিষ্ঠ আঙুলের গিরা ধরে যিলহজ্জ মাসের প্রথমার্ধ গণনা—এক, দুই, তিন... আর মাত্র কয়েকদিন। এভাবেই গাণিতিক নিয়মে গুনতে থাকা হয় অষ্টপ্রহর। মনের মাঝে বিরাজ করে এক মস্ত আনন্দের রাজ্য। অদৃশ্য সেই আনন্দগুলো কতই না মনোহর রূপে সেজে থাকে।

তড়িঘড়ির শেষ আসে না ঈদুল আযহাকে ঘিরে। আমোদের স্রোত নরম স্পর্শকাতর হৃদয়ের প্রান্তভূমির শুষ্ক স্থান ঘেঁষে বইতে থাকে। অজান্তেই লাবণ্যময় বদন ছেয়ে যায় অধরপুটের বাঁকা হাসিতে। নিরস শক্ত মাটির বুক বিদীর্ণ করে অঙ্কুর যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি ক্ষীণ মনেও তীব্র আশার সঞ্চার হয়।

কোষমুক্ত তরবারির সুচালু ধার প্রতিপক্ষকে আঘাত হানার জন্য যেভাবে ক্লান্তিহীন প্রস্তুত থাকে, তারচেয়েও জাঁকজমকপূর্ণভাবে কুরবানী করার ইচ্ছা সতেজভাবে জাগরুক থাকে পরিবারের সদস্যদের মনে। এগুলো ভাবতেই আহ্লাদি মন বাকবাকুম করে ওঠে।

আর যদি কোনো পরিবার ছোট্ট সোনামণিদের দ্বারা আলোকিত হয়ে থাকে, তাহলে তো তার বাঁধভাঙা আনন্দের কথা কলমের নিবে এসে বরফের মতো জমে যায়। তার সীমাহীন আনন্দের কথা যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর হয় না। তাই শুধু সাদা কাগজ কালো দাগে ভরাতে চাই না।

মোহাম্মদপুর গ্রামের মোখলেছুর রহমানের ছোট্ট ছেলে মাহিম। বাবার সাথে কুরবানীর পশুহাটে যাওয়ার বিরাট আবদার তার। শহর, শহরতলী ও উল্লেখযোগ্য নির্ধারিত স্থান ছাড়াও ইদুল আযহার আগে কমবেশি সর্বত্র পশুহাটের দেখা পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশু নিয়ে যাওয়া হয় বেশি এসব হাটে। আশেপাশের মহল্লার বিভিন্ন রকম ক্রেতা এসে ভিড় জমায়। জনস্রোতের উপচে পড়া ভিড়ের সম্মুখীন হতে হয়। কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে পশু কেনা। মনে হয় দেশের সব মানুষ একত্রিত হয়েছে মহল্লার এ ওয়ান-টাইম ছোট্ট হাটে। পদচিহ্নের মাঝে যদি একটা সুঁই পরিমাণ জায়গা ফাঁকা থাকে, তবুও হাফ ছেড়ে বাঁচা যায়। এসব মানবস্রোতের ভিড়ে একের পর এক পশু দেখে চলছে মোখলেছুর রহমান তার ছোট ছেলেকে নিয়ে। কত ত্রুটিপূর্ণ প্রাণী তাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ক্যালকুলেটরও বুঝি হিমশিম খাবে।

বিকেলের রঙহীন ধূসর কুয়াশা অনেক আগেই কেটে গেছে।

১০৮* কুল্লিয়্যাহ ১ম বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ তার ঝাঁপি থেকে অন্ধকার নামিয়ে দেবে পৃথিবীতে। পরক্ষণেই পুরো পৃথিবী গভীর তমসায় ছেয়ে যাবে। বিশাল আকাশের বুকে ঝুলে থাকতে দেখা যাবে অগণিত ও অসংখ্য তারকারাজি। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরার যে ইচ্ছাটুকু ছিল, তা অপূর্ণই রয়ে গেল। কারণ চারপাশ থেকে দিন বিদায়ের চিহ্ন ও রাত আগমনের আলামত দেখা যাচ্ছে। এখন পশুগুলোকেও ইলেকট্রিসিটির আলোতে দেখতে বাধ্য।

অবশেষে তারা একটা পশু ক্রয় করল। হাটের যাবতীয় কাজ তথা ছাড়পত্র এতক্ষণে শেষের পথে। বাবা-ছেলে পৃথিবীর বিছানো পথ ও আকাশের গালিচার নিচ দিয়ে হাঁটা শুরু করেছে। রাতের নির্জনতা ও ছমছমে পরিবেশ আজ বোঝা মুশকিল। ফিরতি মানুষের ঢল আর পশুর হাঁটাচলার কারণে রাস্তাঘাটসহ পরিবেশ ভারী করে তুলেছে। তবে জোছনাময় চাঁদের আলো মাহিমের মুখে গলে গলে পড়ছে। সে যে আজ কী ভীষণ আনন্দ পাচ্ছে, অন্য হৃদয় দিয়ে সবটুকু বোঝা যাবে না। এই নিখুঁত কালো কুচকুচে রাতকে চাঁদ যে কী ভীষণ পরম আলো দিয়ে আগলে রেখেছে, এটা পথচারীরা খুব ভালোই টের পাচ্ছে। অতি সহজেই এগোনো যাচ্ছে। বাড়ির পথটাও যেন এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। পরিশেষে আনন্দচিত্তে বাবা-ছেলে বাড়িতে ফিরল।

আর মাত্র দুদিন বাকি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের। যথারীতি মোখলেছুর রহমান তার বাড়ির সামনের আঙিনায় কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত পশুটি বেঁধে রেখেছে। যোহরের ছালাত শেষ করে ওই পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন পাশের গ্রামের আলেম সোলায়মান সাহেব। মোখলেছুর রহমানকে তার পশুর খেয়াল রাখতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী মোখলেছুর রহমান? পশু তো কেনা হয়ে গেছে, তো কয় দাঁতের?’

সোলায়মান সাহেবের মুখে এ প্রশ্ন শুনে মোখলেছুর রহমান বিস্মিত হলো। মনে হচ্ছে, যেন আকাশ থেকে সবেমাত্র ধপাস করে পড়ল। তার সাথে সাথে অসীম চিন্তাধারা তার পুরো মুখাবয়বে জাপটে ধরে বসেছে। এই ভরদুপুরেও তার চারপাশে যে কালবৈশাখীর ঝড় তীব্র বেগে বয়ে চলছে, এটা যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে। আর এতক্ষণে কষ্টগুলো বিনা দলীলে দুই চোখ দখল করে নিয়েছে। একটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়বে। শুধু হতভম্ব ও পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সোলায়মান সাহেবের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে মিইয়ে যাওয়া গলায় উত্তর দিল, ‘সোলায়মান সাব, দাঁত তো এখনো ওঠেনি’।

সোলায়মান বললেন, দাঁতবিহীন প্রাণীকে তো রাসূল ﷺ কুরবানী দিতে নিষেধ করেছেন। একটি হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা মুসিন্না জন্তু ছাড়া কুরবানী করবে না। যদি তা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য না হয়, তবে জায‘আ (ছয় মাসের ভেড়া) কুরবানী করবে’।[১০৯]

সোলায়মান সাহেবের কথা মোখলেছুর রহমানের কাছে আকাশ ভেঙে পড়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর শোনাল। মানুষ এত হতচকিয়ে যেতে পারে এটা মোখলেছুর রহমানকে না দেখলে অনুমান করা মুশকিল।

তার সাথে সাথে সোলায়মান সাহেব এটাও জানিয়ে দিলেন যে, আর কয় ধরনের ত্রুটিপূর্ণ প্রাণী কুরবানী দিতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর নিম্নবর্ণিত হাদীছটি পাঠ করে শোনালেন।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, ‘চার প্রকার জন্তুর কুরবানী বৈধ হবে না— অন্ধ, যার অন্ধত্ব হওয়া স্পষ্ট; রুগ্ন, যার রোগ প্রকাশ্য; খোঁড়া, যার খোঁড়াভাব সুস্পষ্ট এবং অতি দুর্বল’।[১১০]

তবে এগুলো মোখলেছুর রহমানের জানা ছিল। কিন্তু দাঁতবিহীন প্রাণী কুরবানী দেওয়া যাবে না, সেটা তার জানার বাইরেই ছিল। যেন কোনোদিন তার জানার পৃষ্ঠায় লেখা হয়নি। এমনই অনেক কিছু জানা-অজানা আমাদের মাঝে রয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকে। ফলত অদেখাতেই দিগন্তের মতো দূরে চলে যাই। তফাৎ সৃষ্টি হয় যোজন যোজন। ঝলমলে দুপুরেও পথহারা পথিকের ন্যায় অজানার চৌকাঠ পেরোতে হোঁচট খাই। আর এভাবেই খেই হারিয়ে যাই।

১০৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৩; নাসাঈ, হা/৪৩৭৮; আবূ দাঊদ, হা/২৭৯৭।
১১০. আবূ দাঊদ, হা/২৮০২; নাসাঈ, হা/৪৩৬৯; তিরমিযী, হা/১৪৯৭।

কবিতা

আরাফার ময়দান

-আনিছুর রহমান
তেঁতুল-তলা, বগুড়া।

আরাফার ময়দান—
ঐক্যের মহিমান্বিত স্থান।
বিশ্বের সব মুসলিম নারী-নর,
মাতৃভূমি ছেড়ে আসে আপন ঘর।
স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন ছেড়ে,
দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় ধৈর্য ধরে।
গায়ে জড়ায় সাদা কাফনসম কাপড়,
মনে জাগে রবের ভরসার তোড়।
ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর,
সাদা-কালো নেই ভেদাভেদ কিঞ্চিত।
উঁচু-নিচু সব ভুলে একসাথে দাঁড়ায়,
রবের রহমত আর ক্ষমা ভিক্ষা চায়।
তবু প্রশ্ন জাগে হৃদয়ের মাঝে—
ঐক্য দেখি না কেন আজ সমাজে?
গাযা পুড়ে বিশ্বের মাঝখানে,
মুসলিম শিশুরা শহীদ হয় বোমার আঘাতে।
তবু কেন জাগে না লজ্জা প্রাণে,
কেন নীরবতা মুসলিমের টানে?
কালেমা, ছালাত, ছিয়াম আর হজ্জ—
লোক দেখানো নয় তো এ সব কাজ।
হজ্জ শেষে কেন ভুলে যায় মানুষ,
রবের পথে কেন হয় না অবিচল নিষ্ঠা ও স্পর্শ?
দ্বীন ইসলাম ভুলে যায় দুনিয়ার মোহে,
ফিরে না আবার সত্যের পথের দোহে।
তাই ডাক দিই মুসলিম ঐক্যের,
গড়ি আদর্শ জাতি সত্যের পথের।
মুসলিম যখন বিপদে পড়ে রবে,
ভাই হয়ে পাশে দাঁড়াও সবে।

কুরবানী ঈদ

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

দু’দিন পরই কুরবানী ঈদ
সবার মুখে হাসি,
কেউ বা গরু কেউ বা মহিষ
কেউ বা কিনছে খাসি।
কুরবানী ঈদ পড়বে ছালাত
আনন্দে সুড়সুড়ি,
আল্লাহ খুশি কুরবানীতে
পশুর গলায় ছুরি।
গোশত খাবে নিজে আর—
গরীব দুঃখী মিলে,
ঈদের খুশির আমেজটুকু
ছড়াবে দিলে দিলে।

এলো কুরবানীর ঈদ

-মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

ত্যাগের মহান দীক্ষা নিয়ে
এলো কুরবানী,
মুসলিমের তরে এ যে
রবের মেহেরবানী।
ঈদগাহে ছালাত পড়ে
কুরবানী করে,
মুমিন মুসলিমদের
হৃদয়টা যায় ভরে।
ঈদের দিনে কুশলাদি
সালাম বিনিময়,
ছোট-বড় সবার মনে
আনন্দটা রয়।
প্রতি বছর মোদের মাঝে
তাইতো এলে ঈদ,
গাঁও শহরে সাড়া পড়ে
ভাঙে সবার নিদ।

গ্রীষ্মের দিন

-আব্দুল্লাহ আল-নুমান
শিক্ষার্থী, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস-সালাফিয়্যাহ,
জোরবাড়িয়া কোনাপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

বছরের শুরুতে বৈশাখের আগমন,
জ্যৈষ্ঠ মাস উঁকি দেয় যখন-তখন।
ধান কেটে নেয় কৃষকের দল,
ঘামে ভেজে মাঠ, বয়ে যায় জল।
তপ্ত রোদে পুড়ে যায় গা,
কাজ থামে না, নেই কোনো ছায়া।
হঠাৎ করে আকাশে যেন পেচা তুল
বৈশাখি ঝড়ে বাজে ঢাকঢোল।
আমের গন্ধ, কাঁঠালের ছড়াছড়ি,
ছেলেমেয়েরা দৌড়ায় খুশির ঝড়তড়ি।
জ্বরেও কেউ ছাড়ে না মাঠ,
আম কুড়িয়ে ফিরছে হাতে পাট।
পুকুরে ডুবে প্রচণ্ড গরমে শরীর হয় শান্ত
ছেলেরা জলে খেলাধুলা করে তবেই ক্ষান্ত।
বেলা গড়িয়ে সূর্য ঢলে,
গোসল শেষে হাসি উঠে চোখের কোলে।
নদী-নালা, খাল-বিল শুকায়,
মাছেরা কোথায় আশ্রয় পায়?
পৃথিবী যেন তপ্ত এক কড়ায়
শুধুই গরম, যেন ছায়টুকুও পুড়ে যায়।
তবুও গ্রীষ্মে জীবন বয়,
ঘামে-ধুলায় সুর তুলে যায়।
মাটির ঘ্রাণে, রোদের ছোঁয়ায়,
গোলাভরা ধানে কৃষক খুশি বেজায়।

জৈষ্ঠ্যমাসে

-শফিকুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, গোবিন্দাসী উচ্চ বিদ্যালয়,
ভুয়াপুর, টাংগাইল।

জৈষ্ঠ্যমাসে কাঁঠাল পাকে
আরও পাকে আম,
গাছে গাছে থোকা থোকা
পাকে কালো জাম।
আতা পাকে বেল পাকে
পাকে আনারস,
ডালে ডালে লিচু পাকে
রসে টসটস।
পাকে সাদা জামরুল
পাকে লটকন,
ম-ম ঘ্রাণে কেড়ে নেয়
সকলের মন।

পড়ন্ত বিকাল

-মিহাদ হাসান
মেলান্দহ, জামালপুর।

পড়ন্ত সূর্য লাল রং মেখে,
দিগন্ত জুড়ে হাসে নীরব বুকে।
দিনের শেষে ক্লান্ত আলো,
ধীরে ধীরে নামে সন্ধ্যার কালো।
সোনালি রোদ ঝরে পড়ে মাঠে,
নরম হাওয়া খেলে গাছের পাতার সাথে।
পাখিরা ফিরে যায় আপন নীড়ে,
দিনের গল্প ফুরায় ধীরে ধীরে।
আকাশ ভরে লালিমার রঙে,
প্রকৃতি যেন ডুবে যায় স্বপ্নের ঢঙে।
পড়ন্ত সূর্য বিদায় নেয় হাসি দিয়ে,
নতুন ভোরের আশার কথা রেখে দিয়ে।

ঈদের খুশি

-গোলাম আযম
ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ঈদের খুশি দেয় ছড়িয়ে
সারা পাড়া গায়,
কোরমা পোলাও এসো সবাই
মিলেমিশে খাই।
নতুন জামা পরে চলো
ঈদগাহেরই মাঠে,
খাতা থেকে গুনাহর বোঝা
কমে দরূদ পাঠে।
ঈদের মাঠে সবার সাথে
করি কুশলাদি,
মনের ভেতর পুষে রাখা
সব ভেদাভেদ ভুলি!
ঘরে ঘরে খুশির আমেজ
আনে ঈদের চাঁদ,
নতুন জামা গায়ে পরে
যায় না কেহ বাদ।

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

হামের প্রাদুর্ভাব ও ভেন্টিলেশন সংকট: বিপন্ন শৈশব

বর্তমানে দেশজুড়ে প্রাণঘাতী হামের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। চলতি বছরের মার্চ মাসেই এখন পর্যন্ত অন্তত ৩৮ থেকে ৪৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ৩২টি মৃত্যুই ঘটেছে এই মাসে। বিশেষ করে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহসহ অন্তত সাতটি জেলায় সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা গত কয়েক বছরে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে ঘাটতি ও দীর্ঘ ব্যবধানকে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন। সরকারি হাসপাতালগুলোতে তিল ধারণের জায়গা নেই। রাজধানীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে শয্যা সংকটে অনেক শিশুকে বারান্দায় চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। এর মাঝেই প্রকট হয়ে উঠেছে ভেন্টিলেশন সংকট। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর না পেয়ে গত ১১ দিনে ৩৩টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ৬০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্রুত টিকা সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে রাজশাহীতে পাঁচটি ভেন্টিলেটর পাঠানো হয়েছে এবং বেসরকারি খাত থেকে আরও ভেন্টিলেটর সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। প্রধানমন্ত্রী দ্রুত দেশজুড়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন। হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে নিজ নিজ এলাকায় বিশেষ টিকাদান ক্যাম্পেইন কবে শুরু হচ্ছে জানতে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

দেশে ৩৮৪৯ চাঁদাবাজ, ৯০ ভাগই রাজনৈতিক নেতাকর্মী

সারা দেশে চাঁদাবাজির সিন্ডিকেট নির্মূলে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রস্তুত করা এক প্রাথমিক তালিকায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ৩ হাজার ৮৪৯ জন সক্রিয় চাঁদাবাজ শনাক্ত করা হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, তালিকাভুক্ত এই অপরাধীদের প্রায় ৯০ শতাংশই কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। অঞ্চলের ভিত্তিতে চাঁদাবাজ সংখ্যা: ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা: ১,২৫৪ জন; অন্যান্য জেলা ও পার্বত্য অঞ্চল: ২,৫৯৫ জন; বিশেষ এলাকা: পার্বত্য তিন জেলায় ২৪৬ জন এবং গাজীপুরে ৩৪ জন শনাক্ত হয়েছে। এই চক্রগুলো মূলত সড়ক, হাটবাজার, বাস-টেম্পো স্ট্যান্ড, নৌঘাট, বালুমহাল এবং বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করছে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা নির্মাণকাজ আটকে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, চাঁদাবাজদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করা হবে না। অচিরেই এই তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়ে দেশজুড়ে সমন্বিত অভিযান শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার।

দেশে এক বছরে রোহিঙ্গা বাড়লো ১ লাখ ৭৯ হাজার

২০২৬ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর (UNHCR)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনসংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৭৯ হাজার (১,৭৮,৭৫৭) জন বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে মোট রোহিঙ্গার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ লাখ ৮৪ হাজার ৮৬৪ জনে। তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে মিয়ানমার থেকে নতুন করে প্রায় ১ লাখ ৪৪ হাজার ৪৫৬ জন রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মূলত মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সহিংসতা ও নির্যাতনের কারণে তারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ইরান যুদ্ধে ভয়াবহ খাদ্যসংকটের ঝুঁকিতে বিশ্ব!

মার্কিন-ইসরাঈল বনাম ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট যুদ্ধ পরিস্থিতি কেবল জ্বালানি বাজারের জন্যই নয়, বরং বিশ্বজুড়ে একটি ভয়াবহ খাদ্যসংকটের প্রবল ঝুঁকি তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞরা একে তেলের ধাক্কার চেয়েও বড় বিপদ হিসেবে দেখছেন। ইরান এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল নাইট্রোজেন ও ফসফেট সারের একটি প্রধান উৎস। যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি বন্ধ বা বিঘ্নিত হওয়ায় ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়া তৈরির উপকরণ সরবরাহ প্রায় থমকে গেছে। বর্তমানে উত্তর গোলার্ধে চাষাবাদের প্রধান মৌসুম চলছে। সারের তীব্র সংকট ও আকাশচুম্বী দামের কারণে ভারত, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশগুলোর কৃষকরা বিপাকে পড়েছেন। সময়মতো সার না পেলে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের খরচ অনেক বেড়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে খাদ্যপণ্যের মূল্যে। হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও গ্যাস পরিবাহিত হয়। এটি বন্ধ হওয়ায় কৃষি যন্ত্রপাতির জ্বালানি এবং সার কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এই সংকটের প্রভাব সরাসরি সুপারমার্কেট বা কাঁচাবাজারে পড়তে শুরু করেছে। সারের অভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে চাল, গম ও অন্যান্য দানাদার শস্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যেতে পারে, যা বিশ্বজুড়ে দুর্ভিক্ষ সদৃশ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

মুসলিম বিশ্ব

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ বন্ধে ইসলামাবাদে চার দেশের বৈঠক

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ ও ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা প্রশমনে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে শুরু হয়েছে চার মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। পাকিস্তান, সউদী আরব, তুরস্ক ও মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এই দুই দিনব্যাপী আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত বন্ধে ইসলামাবাদ এখন কূটনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। গত ২৮ মার্চ, ২০২৬ ইং শনিবার রাতে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদেল আতি ও তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান ইসলামাবাদে পৌঁছান। ২৯ মার্চ, রবিবার বিকেলে যোগ দিয়েছেন সউদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান। মূল সম্মেলনের আগে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার এই তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। আলোচনায় গাযা ও লেবানন পরিস্থিতি ছাড়াও হরমুজ প্রণালিসহ আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরান এবং পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তান এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একদিকে তেহরানের সঙ্গে ইসলামাবাদের দীর্ঘদিনের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক-এই দুইয়ে মিলে পাকিস্তান একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। ইরানী বার্তা সংস্থা তাসনীম নিউজের বরাতে জানা গেছে, তেহরান ওয়াশিংটনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় না বসলেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া ১৫ দফা প্রস্তাবের জবাব ইসলামাবাদের মাধ্যমেই পাঠিয়েছে। শনিবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা ফোনালাপ করেন। সংঘাত থামাতে পাকিস্তানের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ইরানী প্রেসিডেন্ট। আলোচনার ইতিবাচক প্রভাব হিসেবে ইরান ইতোমধ্যে ২০টি পাকিস্তানি পতাকাবাহী জাহাজকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের অনুমতি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লিখেছেন- 'আলোচনা, কূটনীতি এবং এ ধরনের আস্থা বাড়ানোর পদক্ষেপই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ'। উল্লেখ্য, ইসহাক দার তার এই বার্তায় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচিকে ট্যাগ করেছেন, যা এই আলোচনার আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। ইসলামাবাদের এই চতুপাক্ষিক বৈঠক থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি এবং বৃহত্তর আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি যৌথ রূপরেখা আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে ইরান ও ইসরাঈলের মধ্যে সরাসরি সংঘাত এড়ানোই এখন বিশ্বনেতাদের প্রধান লক্ষ্য।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সফল কিডনি প্রতিস্থাপন

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নেফ্রোলজি ও ইউরোলজি বিভাগের তত্ত্বাবধানে সফলভাবে একটি কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। সফল অস্ত্রোপচারের পর গত ২৫ মার্চ, বুধবার রোগীকে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। নেফ্রোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলামের অধীনে ভর্তি এই রোগীর কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগ। দাতা (ডোনার) থেকে কিডনি অপসারণ দলের নেতৃত্বে ছিলেন ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. তৌহিদ মো. সাইফুল ইসলাম দিপু। অন্যদিকে, গ্রহীতার শরীরে কিডনি প্রতিস্থাপন দলের নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক একেএম খুরশিদুল আলম ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. রফিকূল ইসলাম। উল্লেখ্য, দেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগে আক্রান্ত এই রোগী সম্পূর্ণভাবে ডায়ালাইসিসের উপর নির্ভরশীল ছিল, যা রোগী ও তার পরিবারের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে রোগীর মায়ের আকুতিতে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য এ বছরের ২২ জানুয়ারি রোগী বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ২৮ জানুয়ারি মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কিডনি প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২ মার্চ রোগীর কিডনি প্রতিস্থাপনের সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়, যেখানে সন্তানকে সুস্থ করে তুলতে কিডনি দান করেন তার গর্ভধারিণী মা। সার্জারির পর রোগী ও তার মা উভয়ই সুস্থ থাকায় ২৫ মার্চ তাদের হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। নিজের সন্তানকে কিডনি দানকারী মা তার ও তার সন্তানের জন্য সবার কাছে দু'আ চেয়েছেন। উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ডা. মো. রফিকূল ইসলাম বলেন, দেশে আইনি জটিলতার কারণে প্রয়োজনের তুলনায় কিডনি প্রতিস্থাপনের সংখ্যা এখনো অনেক কম। তবে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা অত্যন্ত দক্ষ এবং তারা বিভিন্ন জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সক্ষম। তিনি আরও বলেন, রোগীদের আস্থা অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি আধুনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার প্রবণতা কমে আসবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

বিশেষ সংবাদ

প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অতিথিভবনে আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বিশিষ্ট আলেম ও ওলামা-মাশায়েখদের সাথে 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ও 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর মহাপরিচালক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ অংশগ্রহণ করেছেন। পবিত্র রামাযান উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আলেম সমাজের সাথে কুশল বিনিময় করেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও ওলামা-মাশায়েখদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। গত ৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আগত অতিথিদের সাথে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করেন। ইফতারের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রিত আলেমদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। জাতীয় মূলধারার গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সাথে প্রধানমন্ত্রীকে আলাপচারিতায় লিপ্ত হতে দেখা যায়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আলেম-ওলামাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সরকার একটি জনবান্ধব ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে সকলের ধর্মীয় অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা সমুন্নত থাকবে। তিনি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আলেম সমাজের নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন। মাহফিলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিশিষ্ট ওলামা-মাশায়েখগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে দেশের মানুষের সেবায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, রামাযান মাসকে কেন্দ্র করে যমুনায় ধারাবাহিকভাবে কূটনৈতিক, বিশিষ্ট নাগরিক এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইফতার মাহফিলে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাকও উপস্থিত ছিলেন।

সওয়াল-জওয়াব

হজ্জ-উমরা

প্রশ্ন (১): আমি আমার পরিবারের কয়েকজন সদস্য নিয়ে আগামীতে মক্কায় পবিত্র উমরা করার নিয়্যত করেছি। আমার জানার বিষয় হলো আমাদের জন্য মীক্বাত কোনটি এবং কখন ইহরাম বাঁধব? উল্লেখ্য, আমি Qatar Airways-এ রওনা করব তথা ঢাকা থেকে দোহা, দোহা থেকে জেদ্দা।

-মাঈন উদ্দিন
৪৪১/২, কদলগাজী রোড, ফেনী সদর, ফেনী।

উত্তর: মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। ইহরাম বাঁধার জন্য রাসূল ﷺ জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত হতে জলপথ, স্থলপথ বা আকাশপথে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসতে চাইলে এসব মীক্বাত অথবা তার বরাবর স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হবে। বাড়ি, বিমানবন্দর বা অন্য কোনো স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা বৈধ হবে না এবং এভাবে ইহরাম বেঁধে হজ্জ বা উমরা করলে করলে হজ্জ বা উমরা সঠিক হবে না *(ছহীহ বুখারী, হা/১৫২৪)*। এছাড়া বিমানেও ইহরামের ঘোষণা দেওয়া হয়। বিমান যদি দোহা থেকে ট্রানজিট নিয়ে জেদ্দায় যায় তাহলে মীক্বাত হবে ক্বরনুল মানাযিল, যা এখন 'সায়লুল কাবীর' নামে প্রসিদ্ধ। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার। তবে ইহরামের পোশাক সুবিধামতো যেকোনো স্থানে পরতে পারে। ইহরামের পোশাক পরা ও ইহরাম বাঁধা এক নয়।

প্রশ্ন (২): আমি হজ্জ করতে যাব। আগে হজ্জ করিনি। আমি জানতে পেরেছি, হজ্জ তিন প্রকার- ১. ইফরাদ, ২. তামাত্তু ও ৩. কিরান। আমার বয়স প্রায় ৭০। এখন আমার কোন প্রকার হজ্জ করা সহজ ও উত্তম হবে?

-মুক্তিয়ার হোসেন
ঢাকা।

উত্তর: হজ্জে তামাত্তু সহজ ও সর্বোত্তম হজ্জ। কেননা তামাত্তু হজ্জ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ ও আকাঙ্ক্ষা এবং এই হজ্জে দীর্ঘ সময় ইহরামে থাকতে হয় না, উমরার পর বিশ্রাম পাওয়া যায়, শারীরিক চাপ কম হয়। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ-এর সাথে হজ্জ করেছিলেন, যখন নবী ﷺ তাঁর সাথে হাদী (কুরবানীর পশু) নিয়েছিলেন। আর ছাহাবীগণ ইফরাদের (শুধু হজ্জের) নিয়্যতে ইহরাম বেঁধেছিলেন। অতঃপর তিনি ﷺ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে, ছাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে এবং চুল ছোট করে (কছর করে) ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাও। তারপর হালাল অবস্থায় থাকো। অতঃপর যখন যিলহজ্জের ৮ তারিখ (ইয়াওমুত তারবিয়্যাহ) আসবে, তখন হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে এবং তোমরা যেটা নিয়ে এসেছিলে (হজ্জ), সেটাকে উমরার সাথে তামাত্তু বানিয়ে নাও'। তারা বলল, আমরা কীভাবে এটাকে তামাত্তু বানাব, অথচ আমরা তো হজ্জের নিয়্যত করেছি? তিনি ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের যা নির্দেশ দিচ্ছি, তা-ই করো। যদি আমি হাদী সাথে না আনতাম, তাহলে আমিও তোমাদের মতোই করতাম। কিন্তু আমার জন্য ইহরাম থেকে বের হওয়া বৈধ নয়, যতক্ষণ না হাদী তার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৫৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৬)*।

প্রশ্ন (৩): আড়াই বছরের বাচ্চার হজ্জ হবে কি? হজ্জের বিভিন্ন কাজ সে করতে না পারলে বাবা-মা করে দিতে পারবে কি? যেমন- তাওয়াফ, সাঈ, পাথর নিক্ষেপ?

-বাহাদুর শাহ
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর: আড়াই বছর বয়সের বাচ্চার হজ্জ হবে, তবে সেটা নফল হজ্জ গণ্য হবে এবং তার প্রতিদান তার অভিভাবক পাবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/৩১৪৬)*। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাকে ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে, যদি সামর্থ্যবান হয়। হজ্জের যেসব কাজ সে করতে পারবে না, সেসব কাজের ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবকের নিয়্যতই যথেষ্ট। অর্থাৎ অভিভাবক নিজের এবং বাচ্চার পক্ষ থেকে নিয়্যত করে সেসব কাজ সম্পন্ন করবে। বাচ্চার জন্য আলাদা করে তাওয়াফ বা সাঈ করতে হবে না *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৬; ইরওয়াউল গলীল, হা/৯৮৬)*।

প্রশ্ন (৪): আবেগবশত জামরায় কোনো ব্যক্তি যদি সাতটির বেশি পাথর নিক্ষেপ করে, তাহলে তার উপর কোনো দম ওয়াজিব হবে কি?

-সানাউল হাসান
সাতক্ষীরা।

উত্তর: রাসূল ﷺ ও ছাহাবীগণের আমল হলো সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করা *(ছহীহ বুখারী, হা/১৭৫০)*। সাতটির বেশি পাথর নিক্ষেপ করলে যদিও দম ওয়াজিব হবে না, কিন্তু সেটা সুন্নাতের খেলাফ হবে। আবেগের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর বিধানের সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।

প্রশ্ন (৫): ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ কি মিনায় রাত্রিযাপন করা ওয়াজিব?

-ওহিদুল ইসলাম
রাজবাড়ী।

উত্তর: যিলহজ্জ মাসের ১১ ও ১২ তারিখে মিনায় রাত্রিযাপন করা ওয়াজিব আর ১৩ তারিখ সুন্নাহ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৭৪৫; আবূ দাঊদ, হা/১৯৭৩; ফাতহুল বারী, ৩/৫৭৯)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহকে স্মরণ করো। অতঃপর কেউ যদি দুদিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াতাড়ি করে, তবে তার জন্য কোনো পাপ নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি বিলম্ব করে, তবে তার জন্যও পাপ নেই এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও জেনে রেখো যে, অবশ্যই তোমাদের সকলকে তাঁরই নিকট সমবেত করা হবে’ *(আল-বাকারা, ২/২০৩)*।

প্রশ্ন (৬): হাদীছে আছে, আল্লাহ তাআলা আরাফার দিনে মানুষকে ক্ষমা করেন। প্রশ্ন হলো, কাদের ক্ষমা করা হয়?

-আব্দুল মালেক
লক্ষীপুর।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারী সকলেই ক্ষমা করেন। ‘কাকে ক্ষমা করা হয়’ এমন সংকীর্ণতার দিকে যেতে হবে না।

قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَّعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هٰؤُلَاءِ؟

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ আরাফার দিন মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। তিনি তাদের অতি নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব প্রকাশ করে বলেন, তারা কী চাচ্ছে?’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৮)*। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلاَئِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثاً غُبْراً.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলতেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আরাফার দিন বিকালে আরাফায় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে লক্ষ্য করো, তারা আমার কাছে এসেছে এলোমেলো চুল নিয়ে এবং ধুলোয় মলিন হয়ে’ *(মুসনাদে আহমাদ, হা/৭২৮৮)*।

প্রশ্ন (৭): হজ্জে গিয়ে অনর্থক গল্প-গুজবে লিপ্ত হওয়া, মোবাইলে সেলফি তোলা বা যেখানে সেখানে ঘোরাফেরা করলে কি তাদের ছওয়াব কম হবে, নাকি হজ্জ কবুল হবে না?

-ইহসানুল ইসলাম
নাটোর।

উত্তর: হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো হারাম বা নাজায়েয কোনো কাজ করা যাবে না এবং অহেতুক তর্কবিতর্ক বা ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ‘হজ্জ অবস্থায় অশ্লীলতা, আল্লাহর নাফরমানী এবং ঝগড়া-বিবাদ বিধেয় নয়’ *(আল-বাকারা, ২/১৯৭)*। অপ্রয়োজনে সেলফি তোলা হারাম *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০)*। আর লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে হজ্জসহ যেকোনো ইবাদতের চিত্রগ্রহণ করা রিয়া বা লৌকিকতার অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম *(মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৬৩০)*। অতএব, এই হজ্জ কবুল হলেও যে হজ্জের বিনিময় জান্নাত, তা এমন হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন (৮): সময়মতো হজ্জ নিবন্ধন না করার কারণে কেউ ঘুষ দিয়ে ভিসা পেয়েছে। এতে কি হজ্জের উপর কোনো প্রভাব পড়বে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: হজ্জ ইসলামের একটি রুকন বা স্তম্ভ *(ছহীহ বুখারী, হা/৮)*। সুতরাং হজ্জের মতো একটি ফরয ইবাদতের সাথে ঘুষ জাতীয় জঘন্য পাপকে মিশ্রিত করা কখনোই উচিত নয়। হজ্জ

কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রমের সাথে হারামের সংমিশ্রণ করা যাবে না *(আল-বাকারা, ২/১৯৭; ছহীহ বুখারী, হা/১৫২১)*।

প্রশ্ন (৯): কোনো ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফ না করেই মক্কা ছেড়েছে, কিন্তু এখনো সঊদী আরবেই আছে। দুদিন পর ফ্লাইট। তার কি হজ্জ হবে, নাকি আবার এসে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে?

-তুদরাজুল হাসান
নীলফামারী।

উত্তর: বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৩২৭)*। হজ্জের যাবতীয় আমল সম্পন্ন করার পর মক্কা ছাড়ার পূর্বেই বিদায়ী তাওয়াফ করতে হয়। প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি যেহেতু বিদায়ী তাওয়াফ না করে মক্কা ত্যাগ করেছে, তাই তার একটি ওয়াজিব ছুটে গিয়েছে। এক্ষেত্রে যদিও তার হজ্জ বাতিল হয়নি, কিন্তু ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে তাকে দম দিতে হবে। নিয়ম হলো নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে হারাম সীমানার মধ্যে একটি ছাগল কুরবানী করে তার গোশত স্থানীয় ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া *(আল-মুগনী, ৩/৪০৪)*।

প্রশ্ন (১০): হজ্জে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে কেউ যদি হজ্জ করতে না পারে, তাহলে তার করণীয় কী?

-মীর মুশফিক
গাজীপুর।

উত্তর: হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর অসুস্থতার কারণে যদি আরাফার উকূফ (অবস্থান) ছুটে যায়, তাহলে হজ্জ আদায় হবে না। এক্ষেত্রে করণীয় হলো উমরা আদায়ের মাধ্যমে ইহরাম থেকে হালাল হবে, যদি হাদী (উট, গরু বা ছাগল) কুরবানী দেওয়ার সামর্থ্য থাকে; তাহলে তা কুরবানী দিবে। আর যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে ১০ যিলহজ্জের পূর্বে তিনটি ছিয়াম রাখবে, হজ্জের সফর থেকে বাড়িতে ফেরার পর সাতটি ছিয়াম রাখবে এবং আগামীতে এই হজ্জের কাযা করবে *(আল-বাকারা, ২/১৯৬; ছহীহ বুখারী, হা/১৮১০)*।

প্রশ্ন (১১): বাংলাদেশ থেকে উমরা করতে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি কারণবশত মীক্বাত অতিক্রম করে জেদ্দায় প্রবেশ করেছে ইহরাম ছাড়া, পরে মনে পড়েছে। এখন তার করণীয় কী? দম ওয়াজিব হবে কি?

-ফজলুর রহমান
ফরিদপুর।

উত্তর: এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করছে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে এবং তাকে দম দিতে হবে *(বায়হাক্বী, হা/৮৯৯৭; মুওয়াত্ত্বা, হা/১৫৮৩; ফাতহুল বারী, ৩/৩৮৭)*।

প্রশ্ন (১২): জামরাতে কংকর নিক্ষেপের সময় অসুস্থতা, বার্ধক্য বা প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে প্রতিনিধি (ওয়াকিল) নিয়োগ করা যাবে কি?

-হাফিজ আসাদ
খুলনা।

উত্তর: অসুস্থতা, বার্ধক্য বা প্রাণসংহারী ভিড়ের আশঙ্কা থাকলে জামরাতে কংকর নিক্ষেপের প্রতিনিধি (ওয়াকিল) নিয়োগ করা জায়েয। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছরে খাসআম গোত্রের এক মহিলা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের উপর ফরযকৃত হজ্জ আমার পিতাকে এমন অবস্থায় পেয়েছে যে, তিনি অতি বৃদ্ধ, তিনি সওয়ারির ওপর সোজা হয়ে বসতে পারেন না। যদি আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করি, তাহলে কি তার হজ্জ আদায় হবে? তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৫৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৫)*।

প্রশ্ন (১৩): কা'বা চত্বরে দেখা যায়, পুরুষ-মহিলা একসাথে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে। এভাবে পুরুষ মানুষের পাশে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি এবং এসময় মহিলারা কি তাদের মুখ বের করে রাখবে?

-সাহিবা আনোয়ারা
গাজীপুর।

উত্তর: জামাআতে ছালাতের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য শরীআতসম্মত নিয়ম হলো পুরুষের পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৮)*। কা'বা চত্বরেও পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা ছালাতের স্থান নির্ধারিত রয়েছে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক ছালাতে দাঁড়ানো উচিত। এরপরেও বিশেষ কোনো কারণে (যেমন- প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে জায়গা না পাওয়ায়) পুরুষ ও মহিলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে *(আল-মাজমূ আল-ফাতওয়া, ২৩/৩৪৩)*। এমতাবস্থায় মহিলারা তাদের মুখ বের করে রাখতে পারে ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে, কেননা মুহরিম নারীর নিকাব (মুখঢাকা) পরিধান করা নিষিদ্ধ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩৮)*।

প্রশ্ন (১৪): হজ্জে ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করা যাবে কি? ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে কি?

-মাহিনুর রহমান
সিলেট।

উত্তর: হজ্জে ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করা যায়। কেননা সাবান বা শ্যাম্পু সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা হয় না, বরং তা শরীরের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতরাং সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে না *(আল-মাজমূ আল-ফাতওয়া ইবনু উছায়মীন, ২২/১৬০)*।

প্রশ্ন (১৫): কারো তাওয়াফের সময় ওযূ ভেঙে গেছে, কিন্তু ৫ চক্কর শেষ করেছে—এখন সে কী করবে? ভিড়ের কারণে যেতে না পারলে পুনরায় কি তাওয়াফ করতে হবে?

-নোমান
রাজশাহী।

উত্তর: এমতাবস্থায় ওযূ করে পুনরায় তাওয়াফ করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছালাতের মতোই। কিন্তু তাতে তোমরা কথা বলতে পার’ *(তিরমিযী, হা/৯৬০)*।

প্রশ্ন (১৬): ছাফা ও মারওয়ায় সাঈ করার সময় যদি কারো গণনায় ভুল হয়ে যায় এবং তখন বা পরে মনে পড়ে, তাহলে কী করবে?

-যুবায়ের আশফাক
কুষ্টিয়া।

উত্তর: ছাফা ও মারওয়ায় সাঈ করার সময় গণনায় ভুল হলে এবং সাঈ করা অবস্থায় মনে হলে, সন্দেহ পরিত্যাগ করে এবং যা সম্পর্কে নিশ্চিত তার ওপর ভিত্তি করে (সর্বনিম্ন সংখ্যার উপর নির্ভর করে) বাকি সাঈগুলো পূর্ণ করবে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন তার ছালাতে সন্দেহে পড়ে, তখন সে যেন সন্দেহকে পরিত্যাগ করে এবং যা সম্পর্কে নিশ্চিত, তার ওপর ভিত্তি করে *(আবূ দাঊদ, হা/১০২৪)*। আর যদি উমরা সমাপ্তির পরে বা পরবর্তীতে মনে হয়, তাহলে সেদিকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই *(আল-মাজমূ লিন-নববী, ৮/২১-২২)*।

প্রশ্ন (১৭): বিশ্বব্যাপী আরাফার দিন কি এক দিনেই, নাকি আলাদা? অর্থাৎ আরাফায় হাজীদের অবস্থানের দিন, নাকি স্থানীয় চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে ৯ যিলহজ্জ? কোনদিন ছিয়াম পালন করতে হবে?

-তাহসান মাওলা
কুমিল্লা।

উত্তর: যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ আরাফার দিন। যেদিন যে দেশে ৯ যিলহজ্জ হবে সেদিন সে দেশে আরাফার ছিয়াম পালন করবে। আরাফার দিন তথা ৯ যিলহজ্জ ছিয়াম পালন করতে হবে এটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আরাফার দিনের (يوم عرفة) ছিয়ামের ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে ছিয়াম পালনকারীর পূর্বের এক বছরের এবং পরের এক বছরের পাপ মোচন করে দিবেন’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৮০৩; মিশকাত, হা/২০৪৪)*। সুতরাং যেদিন যে দেশে ৯ যিলহজ্জ হবে সেদিন সে দেশে আরাফার ছিয়াম পালন করবে, সঊদীর সাথে মিল রেখে নয় *(ফাতাওয়া ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফতওয়া নং ৪০৭২০; ইসলাম ওয়েব, ফতওয়া নং ২২৭৯৫৩)*। কারণ ছিয়াম ও ঈদের বিধান চাঁদ দেখার সাথে সম্পর্কিত, স্থানের সাথে নয় *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮০; মিশকাত, হা/১৯৭০)*।

প্রশ্ন (১৮): বর্তমান বাস্তবতার আলোকে হজ্জে গিয়ে কী কী কাজ করা উচিত নয়?

-সাজু আহমেদ
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর: হজ্জে গিয়ে এমন কাজ করা উচিত নয় যা হজ্জের লক্ষ্য তথা তাক্বওয়া অর্জন *(আল-বাকারা, ২/১৯৭)*, আল্লাহর স্মরণ *(আল-হজ্জ, ২২/২৮)*, গুনাহ মাফ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৫২১)*, আল্লাহর নৈকট্য ইত্যাদি অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়। যেমন- (১) অশ্লীলতা, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ *(আল-বাকারা, ২/১৯৭)*; (২) রিয়া (লোক দেখানো) ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে হজ্জ করা *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৫)*; (৩) ইহরামের নিষেধাজ্ঞা (চুল/নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার, শিকার করা, সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া ইত্যাদি) লঙ্ঘন করা *(আল-বাকারা, ২/১৯৬)*; (৪) স্ত্রীর সাথে সহবাস করা *(আল-বাকারা, ২/১৯৭)*; (৫) অন্যকে কষ্ট দেওয়া *(ছহীহ বুখারী, হা/১০)*; (৬) সুন্নাহ পরিত্যাগ করা এবং বিদআত করা *(ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭)*;

(৭) সময় নষ্ট করা (গল্প, মোবাইল, অপ্রয়োজনীয় কাজে); ৮. অনর্থক ছবি তোলা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (১৯): পুরুষ-নারীর ইহরামের পোশাক কেমন হবে এবং তা পরিধান করার কোনো নিয়ম আছে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর: পুরুষের ইহরামের পোশাক সেলাইবিহীন দুই টুকরা কাপড় তথা ইযার (লুঙ্গি) ও রিদা (চাদর) হবে এবং মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি বা মোজা পরবে না *(ছহীহ বুখারী, হা/১৫৪২)*। আর নারীর ইহরামের নির্দিষ্ট কোনো আলাদা পোশাক নেই, সে স্বাভাবিক শালীন পোশাক পরবে, যা শরীর ঢেকে রাখে, ঢিলেঢালা হয় এবং সৌন্দর্য প্রকাশ যেন না পায়। ইহরাম অবস্থায় নারী নিকাব (মুখঢাক) ও দস্তানা পরবে না *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩৮)*। তবে পুরুষ মানুষের সামনে ওড়না জাতীয় কিছু দ্বারা মুখ ঢেকে রাখবে *(ইরওয়াউল গালীল, ৪/২১২)*।

প্রশ্ন (২০): অনেকে বলে, হজ্জে গিয়ে যদি কেউ অন্যায় কাজ করে, তাহলে তার পাপ বেশি হবে- এর কোনো দলীল আছে কি?

-সাহিদুল ইসলাম
চট্টগ্রাম।

উত্তর: হজ্জে গিয়ে কেউ যদি অন্যায় কাজ করে, তাহলে তার পাপ বেশি হবে মর্মে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে। আর কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তার অনুরূপ প্রতিফলই দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলম করা হবে না’ *(আল-আনআম, ৬/১৬০)*। তবে হারামে থাকা অবস্থায় পাপ কাজের বিষয়টি অধিক ভয়াবহ *(আল-হজ্জ, ২২/২৫)*।

প্রশ্ন (২১): যারা ওয়ার্ক ভিসা বা অন্য ভিসা নিয়ে সঊদী আরবে আছে। হজ্জের সময় সরকারি অনুমোদন (হজ্জ পারমিট) ছাড়া তারা হজ্জ করতে পারবে কি? হজ্জ করলে হজ্জ হবে কি?

-ফারহান
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর: হজ্জের সময় সরকারি অনুমোদন (পারমিট) ছাড়া হজ্জ করা উচিত নয়। কেননা তাতে শাসকের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং গুনাহ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের’ *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। যে আমার অবাধ্য হলো, সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে শাসকের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল আর যে শাসকের অবাধ্য হলো, সে আমারই অবাধ্য হলো’ *(ছহীহ বুখারী, হা/২৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫)*। তবে কেউ যদি সরকারি অনুমোদন (হজ্জের পারমিট) ছাড়াও হজ্জ করে, তাহলে তার হজ্জ বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন (২২): সামর্থ্য থাকার পরও যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জ না করে, তাহলে তার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

-সাফিকুল ইসলাম
চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর: সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ আদায় করা ফরয *(আলে ইমরান, ৩/৯৭)*। যদি হজ্জের ফরয হওয়াকে কেউ অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফের সাব্যস্ত হবে *(আলে ইমরান, ৩/৯৭; তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/৭২)*। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করল না, তার ইয়াহূদী হয়ে মারা যাওয়া বা খ্রিষ্টান হয়ে মারা যাওয়ার মাঝে কোনো তফাৎ নেই *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/৭৩)*।

যাকাত

প্রশ্ন (২৩): হজ্জে যাওয়ার জন্য যদি টাকা জমা রাখা হয় এবং তা নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে যাওয়ার পূর্বে প্রতিবছর কি তাকে যাকাত দিতে হবে?

-মুরাদ হাসান
রংপুর।

উত্তর: হজ্জের নিয়্যতে জমানো টাকা নিসাব পরিমাণ হলে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হলে তার যাকাত আদায় করা ফরয। আর যদি হজ্জের নিয়্যতে জমানো টাকা নিসাব পরিমাণ না হয়, কিন্তু অন্য টাকার সাথে যুক্ত করলে নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে এই পুরো টাকার যাকাত আদায় করা ফরয। হজ্জে যাওয়ার পূর্বে নিসাব ঠিক থাকার শর্তে প্রতিবছর উক্ত জমানো টাকার যাকাত আদায় করা ফরয *(আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)*।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২৪): অনেকে যমযমের পানি দেশে এনে বেশি মূল্যে বিক্রি করে। এভাবে যমযমের পানি বিক্রি করা বা কিনে খাওয়া কি জায়েয হবে?

-ইয়ামিন
জামালপুর।

উত্তর: যমযমের পানি ক্রয় করার পর অথবা নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করার পর তা বিক্রি করা জায়েয *(আল-মুগনী, ৪/৬২)*। তবে যমযমের পানি যেহেতু বরকতময় পানি, তাই এটা নিয়ে ব্যবসা না করে বিনামূল্যে বিতরণ করা উচিত।

প্রশ্ন (২৫): আমার শহরে ১০ কাঠা জমি আছে। তার মোটামুটি ২/৩ কাঠা বিক্রি করলে আমি আমার স্ত্রীসহ হজ্জ করতে পারব। কিন্তু সন্তানেরা বিক্রি করতে দিবে না। এটা ছাড়া হজ্জ করার মতো সম্পদও আমার নেই। এখন এই জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া যাবে কি?

-শহিদুল ইসলাম
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ চালানোর জন্য যতটুকু জমি ব্যবহার করতে হয় তার অতিরিক্ত জমি থাকলে এবং তার মূল্য দ্বারা হজ্জের যাবতীয় খরচ পূরণ করা গেলে সেই জমির মালিকের উপর হজ্জ ফরয *(আলে ইমরান, ৩/৯৭; আল-মুগনী, ৩/২১৭-২১৮)*। সন্তানেরা হয়তো না বুঝে জমি বিক্রি করতে নিষেধ করছে। তাদেরকে আল্লাহর বিধান বুঝাতে হবে এবং আল্লাহর বিধান পালনে বাধা দিলে যে গুনাহ ও ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে তা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতে হবে।

প্রশ্ন (২৬): অনেকে চায়, মক্কা-মদীনায় গিয়ে যেন তার মৃত্যু হয়। এরকম আকাঙ্ক্ষা করা জায়েয হবে কি? সেখানে মৃত্যু হলে কোনো ফযীলত আছে কি?

-আকিব
বরিশাল।

উত্তর: মদীনায় মৃত্যুবরণ করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করা এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য মদীনায় বসবাস করার চেষ্টা করা যায়। মদীনায় মৃত্যুবরণ করার ফযীলত হলো রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ লাভ করা যায়। রাসূল ﷺ বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا ؛ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا 'যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ (নিয়মিত বসবাস) করতে সক্ষম সে যেন সেখানে মৃত্যুবরণ (নিয়মিত বসবাস) করে। কেননা আমি মদীনায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্য সুপারিশ করব' *(তিরমিযী, হা/৩৯১৭)*। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় মৃত্যু হওয়ার জন্য দু'আ করতেন এবং তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'হে আল্লাহ! আপনার পথে আমাকে শহীদ হওয়ার মর্যাদা দান করুন এবং আপনার রাসূলের শহরে আমাকে মৃত্যু দান করুন' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯০)*। হাদীছের গ্রন্থগুলোতে মক্কায় মৃত্যুবরণ করার ফযীলত সংক্রান্ত কিছু হাদীছ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু হাদীছ মাওযূ বা জাল আর কিছু হাদীছ যঈফ বা দুর্বল *(সিলসিলা যঈফা, ৬/৩১৯-৩২৪)*।

প্রশ্ন (২৭): আমাদের এলাকায় অনেকেই হাঁসের ডিম মুরগির নিচে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে থাকেন। বাচ্চা ফোটার পর যখন সেগুলো কিছুটা বড় হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে পানিতে নেমে যায়; কিন্তু মা মুরগি পানিতে নামতে পারে না, ফলে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতে মা মুরগি ও বাচ্চাগুলোর মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। এরকম করা কি ইসলামে জায়েয?

-আব্দুল্লাহ হাসান
দিনাজপুর।

উত্তর: পশুপাখির উপর কোনো বিধান নেই। তাই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য যেভাবে বাচ্চা ফুটানো বা লালনপালন করলে ভালো হয়, সেভাবেই করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন' *(আল-বাকারা, ২/২৯)*।

কুরবানীর বিধান

প্রশ্ন (২৮): কোন কোন পশু কুরবানী করা যাবে? বয়স কত হতে হবে? কোন পশু দ্বারা কুরবানী করা উত্তম?

-খুবাইব
ময়মনসিংহ।

উত্তর: ক. উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া দিয়ে কুরবানী করা যাবে *(সূরা হজ্জ, ২২/৩৪; তাফসীরে কুরতুবী, ১২/৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৩)*। খ. পশুর দাত পড়ে নতুন দাঁত উঠতে হবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৩; নায়লুল আওতার, ৫/১৩৪)*। গ. হৃষ্টপুষ্ট দুম্বা দিয়ে কুরবানী করা উত্তম *(নায়লুল আওতার, ৫/১৩৫-১৩৬)*।

প্রশ্ন (২৯): কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে কুরবানী ওয়াজিব হয়? পরিবারের সবার সম্পদ কি হিসাব করতে হবে? যেমন- স্ত্রীর স্বর্ণ?

-তোফাজ্জল আহমেদ
লালমনিরহাট।

উত্তর: কুরবানী দেওয়া সম্পদের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং যারা দেওয়ার সামর্থ্য রাখে তারা কুরবানী দিবে। কুরবানী দেওয়া সুন্নাত, ওয়াজিব নয় *(ফাতহুল বারী, ১৬/৩; তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৭৯)*।

প্রশ্ন (৩০): আমি হজ্জ করিনি, কিন্তু করার ইচ্ছা আছে। হজ্জে গিয়ে যে দুম্বা কুরবানী করব তার গোশত কি আমি খেতে পারব বা পরিবারের জন্য নিয়ে আসতে পারব?

-পলেন আহসান
গুলশান, ঢাকা।

উত্তর: তামাত্তু ও কিরান হজ্জে কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব এবং সেই কুরবানীর গোশত হজ্জকারীর নিজে খাওয়া ও পরিবারের জন্য নিয়ে আসা জায়েয *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৩)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা তা থেকে খাও এবং মিসকীন ও ফকীরকে খাওয়াও’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, ‘অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও’ *(আল-হাজ্জ, ২২/২৮)*।

প্রশ্ন (৩১): চাঁদ দেখা গেলে যারা কুরবানী দিবে না তারা কি নখ, চুল কাটতে পারবে? আর যারা কুরবানী দিবে তারা ভুলে কেটে ফেললে কোনো কাফফারা আছে কি?

-খলিলুর রহমান
ফরিদপুর।

উত্তর: কাটতে পারবে। উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে, আর তোমাদের কেউ যদি কুরবানী করার মনস্থ করে, তাহলে সে যেন চুল কিংবা নখ না কাটে’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭)*। সুতরাং উক্ত বিষয়টি শুধু কুরবানীদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর ভুলবশত কুরবানীদাতা চুল কেটে ফেললে তার কোনো কাফফারা নেই *(আল-বাকারা, ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (৩২): কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকা কাদের দেওয়া যাবে? লেজকাটা পশু দিয়ে কুরবানী করা যাবে কি?

-আবুল হাসান
কুমিল্লা।

উত্তর: ক. কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকা ছাদাকা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রদান করা যাবে। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (কুরবানীর) উটের চামড়া ছাদাকা করতে আদেশ করেছেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৩১৭)*। খ. কুরবানী যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাই ত্রুটিমুক্ত সুন্দর পশু দিয়ে কুরবানী করা উচিত। অপারগ হলে লেজকাটা পশু দিয়ে কুরবানী করা যাবে *(আল-মুগনী, ৯/৪৪২)*।

প্রশ্ন (৩৩): কুরবানীর পশু যদি ঈদের আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তা দিয়ে কুরবানী করা যাবে কি?

-জুয়েল রানা
রাজশাহী।

উত্তর: এক্ষেত্রে সেই পশু বিক্রি করে নতুন সুস্থ পশু ক্রয় করবে। কুরবানীর পশু যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তা দ্বারা কুরবানী আদায় হবে না। গুরুতর অসুস্থ হওয়ার আলামত হলো খাবার গ্রহণে অক্ষমতা, চলতে বা দাঁড়াতে অক্ষম হওয়া ইত্যাদি *(আবূ দাঊদ, হা/২৮০২; আউনুল মা‘বূদ, ৭/৩৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৪): জনৈক সম্পদশালী ব্যক্তি প্রায় প্রতিবছর ৪/৫টি বড় গরু এবং ৩/৪টি বড় ছাগল কুরবানী করেন। এভাবে এক ব্যক্তির কয়েকটি পশু কুরবানী করার বিধান কী? এতে কি ছওয়াব বেশি পাবে?

-তোফাজ্জল হোসেন
বনানী, ঢাকা।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি যদি সামর্থ্যবান হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একাধিক পশু কুরবানী করে, তাহলে সে তাতে বেশি নেকী পাবে এবং দরিদ্র মানুষেরা উপকৃত হবে। সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের একাধিক পশু কুরবানী করাই উত্তম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের বছর একশটি গরু কুরবানী করেছিলেন এবং নিজে হাতে ৬৩টি উট যবেহ করেছিলেন, বাকিগুলো আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে যবেহ করার আদেশ করেছিলেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭৪)*।

প্রশ্ন (৩৫): প্রতিবছর কুরবানীতে আমার প্রতিবেশীরা ২/৩ জন কুরবানী করতে ও গোশত কাটতে সহযোগিতা করে। তারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, কুরবানী দিতে পারে না। আমি তাদের কিছু টাকা দেই। পাশাপাশি কিছু গোশত দেই। এভাবে টাকা ও গোশত দেওয়া শরীআহ অনুযায়ী কি সঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: কুরবানীর গোশত থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে কাউকে কিছু দেওয়া যাবে না। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার কুরবানীর পশুর দেখাশুনা করতে, এদের গোশত, চামড়া ও আচ্ছাদন বিতরণ করতে এবং তা হতে কাউকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু না দিতে নির্দেশ দেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১৭১৭)*। তবে তারা যেহেতু গোশত পাওয়ার হক্বদার, তাই হক্বদার হিসেবে কিছু গোশত দেওয়া যায় এবং পারিশ্রমিক হিসেবে আলাদাভাবে টাকা দিতে হবে *(ইবনু মাজাহ, হা/২৪৪৩)*।

প্রশ্ন (৩৬): আমার ছেলে মুশফিক আহসান। বয়স ১১ বছর। আমি এবছর তার পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করতে চাই। প্রশ্ন হলো, এভাবে কুরবানী করা যাবে কি?

-মোরসালিন আহসান
ঢাকা।

উত্তর: উক্ত ব্যক্তি তার, তার ছেলে ও পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবূ আইয়ূব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে আমি প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় কুরবানীর বিধান কেমন ছিল? তিনি বললেন, কোনো লোক তার ও তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে একটি ছাগল দ্বারা কুরবানী আদায় করত এবং তা নিজেরাও খেত, অন্যান্য লোকদেরকেও খাওয়াত *(তিরমিযী, হা/১৫০৫)*। পশু কুরবানীর সময় নাম উল্লেখ করতে পারে, যেমন- রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৭)*। হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা যবেহ করলেন এবং বললেন, بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ‘আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার ও তাঁর উম্মতের পক্ষ হতে এটা কবুল করে নিন’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৭): জনৈক ব্যক্তি কুরবানীর নিয়্যতে একটি পশু ক্রয় করল। কিন্তু কুরবানীর নির্ধারিত দিনের আগে সেই পশুটি হারিয়ে গেল। পরে সে আরেকটি পশু কিনে কুরবানী করল। ঈদের পর প্রথম হারানো পশুটি ফিরে পেল। এখন প্রশ্ন হলো এই ব্যক্তির উপর কি আবার সেই প্রথম পশুটি কুরবানী করা ওয়াজিব হবে, নাকি দ্বিতীয় কুরবানীটিই যথেষ্ট হবে?

-আশিক ইকবাল
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর: কুরবানী করার নির্দিষ্ট সময়ের পর হারিয়ে যাওয়া পশুটি পাওয়া গেলে সেটি আর কুরবানী করতে হবে না। কেননা কুরবনীর সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর উক্ত সময়ের (১০, ১১, ১২ যিলহজ্জ) এর মধ্যে পাওয়া গেলে কুরবানীদাতা চাইলে কুরবানী করতে পারেন, তবে আবশ্যক নয়।

প্রশ্ন (৩৮): একজন জানতে চেয়েছেন, তারা তিন ভাই। বাবা নেই, মা আছে। বড় দুজন কর্মজীবী, ছোট জন শিক্ষার্থী। তারা সংসারে সবাই একসাথে খায় অর্থাৎ ভিন্ন হয়নি। তাদের গরু কুরবানী দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তারা ভাগেও কুরবানী দেয় না। তারা দুজনে মিলে সবসময় একটি ছাগল কুরবানী দেয়। এভাবে কুরবানী দিলে সঠিক হবে কি? নাকি আরো ছাগল কুরবানী দিতে হবে?

-আব্দুল্লাহ
ঢাকা।

উত্তর: একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার পরিবারের সবার পক্ষ হতে একটি বকরি কুরবানী করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৭২১০)*। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের উপর প্রতি বছর কুরবানী করা কর্তব্য’ *(আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; তিরমিযী, হা/১৫১৮)*। সুতরাং একটি খাসিই একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ঠ।

প্রশ্ন (৩৯): আমি এবছর কুরবানী দেওয়ার নিয়্যত করেছি। ইতঃপূর্বে কুরবানী দেওয়া হয়নি। প্রশ্ন হলো, কুরবানীর গরু ক্রয়ের ব্যাপারে ইসলামের কোনো নির্দেশনা আছে কি? কী কী দেখে কুরবানীর গরু কিনব?

-আব্দুল গফুর
ময়মনসিংহ।

উত্তর: কুরবানীর পশু কেনার সময় নতুন দাঁত হওয়া, সুস্থতা এবং শারিরীক খুঁতহীনতা দেখে পশু ক্রয় করতে হবে। লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো- ১. পশুর দাঁত পড়ে নতুন দাঁত উঠতে হবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৩)*। ২. চোখ ও কান ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন কুরবানীর প্রাণীর চোখ-কান ভালোভাবে দেখে নেই *(আবূ দাঊদ, হা/২৮০৪)*। ৩. চারটি দোষ থেকে মুক্ত হওয়া- ক. স্পষ্ট কানা হওয়া। খ. স্পষ্ট রোগী হওয়া (যেমন- চুলকানি-পাঁচড়া বা অন্য কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া)। গ. স্পষ্ট খোঁড়া হওয়া এবং এমন অচল হওয়া, যা চলতে পারে না। ঘ. এমন দুর্বল হওয়া, যার শরীরে কোনো মাংস নেই *(ইবনু মাজাহ, হা/৩১৪৪)*। সুতরাং খুঁতযুক্ত, অন্ধ, খোঁড়া, শিং ভাঙা অথবা অতি দুর্বল পশু কুরবানী করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪০): এলাকায় এক ব্যক্তি বলেন, বলদ গরু ও খাসি কুরবানী দেওয়া যাবে না। খাসি কুরবানী দিলে কুরবানী হবে না। একথা কি সঠিক?

-মকুল মিয়া
পাবনা।

উত্তর: খাসি কুরবানী করাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) খাসি কুরবানী করেছেন। আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তিনি শিং বিশিষ্ট মোজাতাজা বড় সাইজের দুটি সুদর্শন খাসি করা ভেড়া ক্রয় করতেন। যার একটি যবেহ করতেন তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যারা আল্লাহ তাআলার তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ব্যাপারে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে। আর অন্যটি যবেহ করতেন তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে *(ইবনু মাজাহ, হা/৩১২২; ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৫১; আবূ ইয়া'লা, ২/১০৫)*।

প্রশ্ন (৪১): আমরা শরিকানায় একটি গরু কুরবানী দেই। প্রশ্ন হলো গোশত ভাগ করার আগেই সেখান থেকে ফকীর-মিসকীনকে দিতে হবে, নাকি ভাগ করে নিয়ে সবাই নিজের মতো করে দিবে?

-রাসেল
রাজশাহী।

উত্তর: পরিবার নয়, সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে পশু কুরবানী করা হলে প্রত্যেক শরীক নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করার পর তা থেকে দরিদ্র মানুষদেরকে দিবে।

প্রশ্ন (৪২): একই গরুতে একই ব্যক্তি কুরবানী ও আকীকার নিয়্যত করতে পারবে কি? এভাবে কুরবানী দিলে তার বিধান কী?

-ছবিরুল হাসান
গাইবান্ধা।

উত্তর: উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্বে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, হাদীছে গরু দিয়ে আকীকা করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আকীকা একমাত্র ছাগল, দুম্বা ও ভেড়া দিয়ে প্রদান করার প্রমাণ হাদীছ থেকে পাওয়া যায় *(আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৪, ২৮৪২; নাসাঈ, হা/৪২১৯)*। সুতরাং একই গরুতে একই ব্যক্তি কুরবানী ও আকীকার নিয়্যত করতে পারবে না এবং সপ্তম দিনের পর আকীকা হবে না *(আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৮)*।

প্রশ্ন (৪৩): কেউ যদি কুরবানীর সম্পূর্ণ গোশত কাউকে না দিয়ে ফ্রিজে রেখে দীর্ঘদিন যাবৎ পরিবারকে খাওয়ায়, তাহলে তার কুরবানী হবে কি?

-হুমাম জিদান
পাবনা।

উত্তর: কেউ যদি কুরবানীর গোশত অসহায় মানুষকে না দিয়ে শুধু তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খায়, তাহলে তার কুরবানী বিশুদ্ধ হবে; কিন্তু তিনি গুনাহগার হবেন। কেননা আল্লাহ আদেশ করেন, '... তোমরা তা থেকে খাও এবং মিসকীন-ফকীরকে খাওয়াও' *(আল-হজ্জ, ২২/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, 'অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও' *(আল-হাজ্জ, ২২/২৮)*। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর গোশতের ব্যাপারে বলেন, 'তোমরা খাও, জমা রাখো এবং দান করো' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭১)*। তবে এরকম কোনো মানুষ না থাকলে ফ্রিজে রেখে দীর্ঘদিন ধরে খেতে পারে। তবে ফকীর-মিসকীন থাকলে অবশ্যই দিতে হবে, নতুবা গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (৪৪): গত কুরবানী ঈদের দুই দিন পর আমাদের একটি ছাগল হয়েছে, তাহলে আসন্ন ঈদে ছাগলটি কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

-মো. জুনাইদ আলী
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত উক্ত ছাগলের যদি দাঁত পড়ে নতুন দাঁত হয়, তাহলে তা দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে। কেননা ছাগল কুরবানীর পশু হিসেবে মুসিন্না (দাঁতওয়ালা) হওয়া শর্ত। জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মুসিন্না (দাঁত পড়ে নতুন দাঁত উঠা) ছাড়া কুরবানী করবে না' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৩)*।

প্রশ্ন (৪৫): বণ্টনের জন্য কুরবানীর গোশত কোনো জায়গায় দেওয়ার পর বণ্টন শেষে অবশিষ্ট থেকে গেলে তা আবার দাতারা নিতে পারবে কি?

-হামযা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: কুরবানীদাতা কুরবানীর গোশত প্রয়োজন অনুযায়ী রেখে দিয়ে বাকি গোশত ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। বণ্টনের জন্য দেওয়ার পর অবশিষ্ট থেকে গেলে এবং নেওয়ার মতো কেউ না থাকলে পুনরায় দাতারা তা নিতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর গোশতের ব্যাপারে বলেন, 'তোমরা খাও, জমা রাখো এবং দান করো' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭১)*।

প্রশ্ন (৪৬): কোনো ব্যক্তি যদি কয়েকটি গরু যবেহ করে, তাহলে কি সব গরু থেকেই গোশত ফকীর-মিসকীনকে দিতে হবে, নাকি নির্দিষ্ট ২/১টি থেকে দিলেই হবে?

-মশিউর রহমান
বনানী, ঢাকা।

উত্তর: ব্যক্তির সুবিধামতো দুয়েকটি পশু থেকে গোশত দিলেই যথেষ্ট হবে। কুরবানীদাতা প্রয়োজন অনুযায়ী গোশত রেখে দিয়ে বাকি গোশত ফকীর-মিসকীনকে দিয়ে দিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তা থেকে খাও এবং মিসকীন ও ফকীরকে খাওয়াও' *(আল-হাজ্জ, ২২/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, 'অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও' *(আল-হজ্জ, ২২/২৮)*।

প্রশ্ন (৪৭): শহরে ঈদের জামাআত কোথাও সাড়ে ৮টায়, আবার কোথাও ৯টার সময় অনুষ্ঠিত হয়। আমরা কিছু মানুষ আলাদা হয়ে ঈদের ছালাত ৭টায় বা আরো আগে পড়ে তাড়াতাড়ি কুরবানী করি। এভাবে ঈদের ছালাত পড়া বা কুরবানী করা কি ঠিক হবে?

-গোলাম আযম
শাহবাগ, ঢাকা।

উত্তর: সূর্য যখন উদয়স্থল থেকে কিছুটা উঁচুতে অবস্থান করে এবং যখন ছালাতুল ইশরাক (চাশতের ছালাত) সময় হয়, তখন থেকে ঈদের ছালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় *(আবূ দাঊদ, হা/১১৩৫; নায়লুল আওতার, ৩/৩৪৮)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর রাযিয়াল্লা-হু আনহু লোকদের সাথে ঈদুল ফিত্বর কিংবা ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করতে যান। (ছালাত আরম্ভ করতে) ইমাম দেরি করাকে তিনি অপছন্দ করলেন এবং বললেন, (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) যুগে এ (ইশরাকের) সময় আমরা ঈদের ছালাত আদায় শেষ করতাম। অন্যান্য ছালাতের মতো ঈদের ছালাতও আউয়াল ওয়াক্তে (ওয়াক্ত শুরুর সাথে সাথে) আদায় করা উত্তম। উম্মু ফারওয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন, 'আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূ দাঊদ, হা/৪২৬)*। সুতরাং আউয়াল ওয়াক্তেই ঈদের ছালাত আদায় করতে হবে এবং এরপর কুরবানী করা যাবে।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): দান-ছাদাকার মাধ্যমে ছালাত, ছিয়ামসহ অন্যান্য ইবাদতের ঘাটতি কিয়ামতের দিন পূরণ হবে কি? হলে এর দলীল কী?

-গোলাম রাব্বি
বরিশাল।

উত্তর: কোনো ইবাদতে ফরযে বান্দার কমতি থাকলে বিচারের দিন সেই ইবাদতের নফল দিয়ে তা পূর্ণ করা হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন সব জিনিসের পূর্বে বান্দার যে আমলের হিসাব হবে, তা হলো ছালাত। যদি তার ছালাত সঠিক হয়, তাহলে সে সফলকাম হবে এবং নাজাত পাবে। আর যদি ছালাত বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয ছালাতের মধ্যে কিছু কমতি হয়ে থাকে, তবে মহান আল্লাহ বলবেন, দেখো, বান্দার কোনো নফল ছালাত আছে কি? থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর সকল আমলই এভাবে গ্রহণ করা হবে' *(আবূ দাঊদ, হা/৮৬৪; তিরমিযী, হা/৪১৩; নাসাঈ, হা/৪৬৬)*। অর্থাৎ ফরয ছিয়ামে ঘাটতি থাকলে সুন্নাত বা নফল ছিয়াম দ্বারা তা পূর্ণ করা হবে, যাকাতে ঘাটতি থাকলে নফল ছাদাকা দিয়ে তা পূর্ণ করা হবে *(আল-মাফাতীহ*

ফী শারহিল মাসাবীহ, ২/৩০৬)। তবে রামাযানের ফরয ছিয়ামের ক্ষেত্রে যাকাতুল ফিতরের বিষয়টি ভিন্ন *(আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯)*।

প্রশ্ন (৪৯): কা'বা ঘরের চতুর্দিকে সাত চক্কর ঘুরতে হয়, সাঈ করার সময় সাত বার সাঈ করতে হয়, সাত দিনে আকীকা করতে হয়, জাহান্নামের দরজা সাতটি, কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে, আসমান সাতটি। এভাবে সাত সংখ্যা নির্ধারণ করার কি কোনো কারণ আছে?

-রবিউল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সাত সংখ্যা নির্বাচিত করেছেন, যেমন- সাতটি আসমান, সাতটি যমীন ইত্যাদি। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বিধান পালনের ক্ষেত্রে সাত সংখ্যাকে বাছাই করেছেন, যেমন- তাওয়াফের সাত চক্কর, ছাফা-মারওয়ার মাঝে ৭ বার সাঈ করা ইত্যাদি। এ থেকে বুঝা যায়, সাত সংখ্যাটির অবশ্যই বিশেষত্ব রয়েছে; কিন্তু কী সেই বিশেষত্ব তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। আলেমগণ এই সংখ্যার যেসব বিশেষত্ব বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সেগুলো চূড়ান্ত নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ একাধিক বিশেষত্ব উল্লেখ করার পর এটাই বলেছেন যে, এগুলো চূড়ান্ত নয়; বরং মূল হিকমত ও রহস্য একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন *(যাদুল মাআদ, ৪/৯১-৯২)*। সুতরাং এসমস্ত বিষয়ের পিছনে পড়া বা বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (৫০): জামাআতে ছালাত শেষ করার পর সুন্নাত পড়ার জন্য নাকি জায়গায় পরিবর্তন করা সুন্নাত। এরকম কোনো হাদীছ আছে কি?

-নুমায়রা বিনতে নোবেল
বাইশগাঁও, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর: হ্যাঁ, একথা ঠিক। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি ফরয ছালাত আদায়ের পর সামনে এগিয়ে বা পিছনে সরে অথবা ডানে বা বামে সরে নফল ছালাত আদায় করতে অপারগ? (অর্থাৎ সরে গিয়ে সুন্নাত ছালাত আদায় করবে)' *(ইবনু মাজাহ, হা/১৪২৭; আবূ দাঊদ, হা/১০০৬)*। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন এক ছালাতকে অপর ছালাতের সাথে মিলিয়ে না আদায় করি, যতক্ষণ কোনো কথা না বলি অথবা সে স্থান হতে সরে না যাই' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৩; আবূ দাঊদ, হা/১১২৯)*।

সম্পাদকীয়র বাকি অংশ

তবে মদীনায় যত মুনাফেক্ব থাকবে তারাও ভূমিকম্পের ভয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে। দাজ্জালের অনুসারীদের বড় অংশ হবে ইয়াহূদীরা; বিশেষ করে ইরানের ইসফাহান শহরের ইয়াহূদীরা।

দাজ্জালের এই ভয়াবহ ফিতনা থেকে মুসলিমদের বাঁচাতে তাদের উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন। আর তিনিই প্রকৃত মাসীহ। মিথ্যা মাসীহ দাজ্জাল যখন সত্য মাসীহ ঈসাকে দেখবে, তখন সে গলে যেতে থাকবে। আর ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে নিজে হাতে হত্যা করবেন। এইভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনার পরিসমাপ্তি হবে।

দাজ্জালের এই ভয়াবহ ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের ঈমান হতে হবে আছহাবে কাহফ ও আছহাবে উখদূদের মতো। মহান আল্লাহর তাওহীদে অগাধ আস্থা ও পরকালে সীমাহীন বিশ্বাস ছাড়া দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। অবৈধ এক টাকার প্রতিও যদি লোভ থাকে, তাহলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। কেননা তখন সকল সম্পদ দাজ্জালের কাছেই থাকবে আর মুমিনরা থাকবে ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব। আছহাবে উখদূদ যেভাবে ঈমান বাঁচাতে আগুনে প্রবেশ করেছিল, আছহাবে কাহফ যেভাবে ঈমান বাঁচাতে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই ঈমান বাঁচাতে যারা দুনিয়া বিসর্জন দিতে প্রস্তুত তারাই একমাত্র ঈমান ধরে রাখতে পারবে। আর এই জন্যই পরকালে বিশ্বাস মযবূত হতে হবে। জান্নাতে নিজেদের স্থানকে যারা চোখ বন্ধ করলে দেখতে পায়, তাদের কাছে দুনিয়ার আগুন জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। তাদের কাছে মৃত্যু জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা। তাদের কাছে সকল বিপদ ও সমস্যা জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। তাই জান্নাতের আশায় সকল কিছুই তাদের জন্য সহজ।

সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মৃত্যুই আমাদের ক্বিয়ামত। আমরা যতই ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আলাইহিস সালাম নিয়ে আলোচনা করি না কেন, তখন নতুন কোনো নবীও আসবে না; নতুন কোনো কিতাবও অবতীর্ণ হবে না। বরং আজ যে কুরআন ও হাদীছ আছে সেটির উপরেই তারা আমল করবেন। এই কুরআন ও হাদীছের উপর আমল ও ঈমানের মাধ্যমেই তারা নিজেদের ঈমানকে হেফাযত করবেন। সুতরাং যেহেতু আমাদের মৃত্যুই আমাদের ক্বিয়ামত আর আমাদের কাছে কুরআন ও হাদীছ আছে, তাই আমাদের উচিত নিজের আমলের সংশোধন ও কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে ঈমান অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া। *(প্র. স.)*

মাকতাবাতুস সালাফ

হজ্জ, কুরবানী ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়িলের
নির্ভরযোগ্য ফিকহি সমাধান জানতে আজই সংগ্রহ করুন

ফিকহুস সালাফ
(আহলুল হাদীছ ও সালাফী মানহাজের ফিকহ)
লেখক: আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী খান (রহ.)

■ দলিলভিত্তিক আলোচনা ■ মাযহাবীয় পক্ষপাতহীন ব্যাখ্যা
■ সুন্নাহ ও ছাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী মাসায়েল



মাসিক আল-ইতিছামের সম্মানিত
গ্রাহক-এজেন্টগন পাচ্ছেন ১০% ছাড়ে।

পুরো সেট
~~১৭৫০~~ ১৫৭৫ টাকা মাত্র

ফিকহুল হাদীছ ফাতওয়া সিরিজ
সংকলনে: আল-জামি'আহ আস সালাফিয়্যাহ ফাতওয়া বোর্ড
বোর্ড প্রধান: আব্দুল প্রাযযাক বিন ইউসুফ



ইসলামী জীবনের প্রথম শর্ত পবিত্রতা, আর তার সর্বোচ্চ প্রকাশ সালাত। এই দুই ইবাদতের শুদ্ধতা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। "ফিকহুল হাদীস ফাতওয়া সিরিজ"-এর এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে আল-ইতিছাম-এ প্রকাশিত দলিলভিত্তিক ফাতওয়াগুলোর বাছাইকৃত অংশ, সাথে সংযোজিত হয়েছে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক বিষয়।

পুরো গ্রন্থজুড়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পবিত্রতা ও সালাত-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। ওযু, গুসল, নাপাকি, মহিলাদের মাসিক অবস্থা, সালাতের রুকন ও শর্ত, জামাআত, ইমামতি, ভ্রমণকালীন নামায—সবই এখানে সাজানো হয়েছে দলিল ও ফিকহি বিশ্লেষণের আলোকে।

এই সংকলন পাঠককে ইবাদতের সঠিক অনুশীলনে সহায়ক ও শরঈ নির্দেশনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

পৃষ্ঠা: ৪৬৪ | মূল্য: ৫৮০ ৳

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত

প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১

নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০

নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩

নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬

বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩

বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭

বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বিরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫